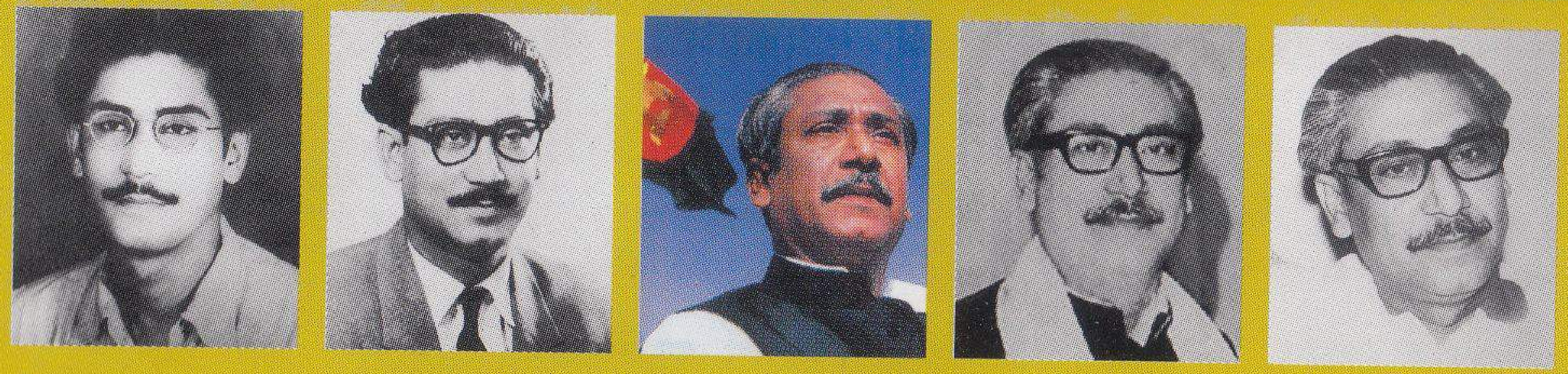

শেখ মুজিবের ছেলেবেলা

বেবী মওদুদ

শেখ মুজিবের ছেলেবেলা • বেবী মওদুদ

বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট

Northern University * Bangladesh *
NUB Library

শেখ মুজিবের ছেলেবেলা

বেবী মওদুদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

উ ৎ স র্গ

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের
শিশু-কিশোর

NUB LIBRARY

ACCESSION NO.	৭৪৯৭৬
ACCESSION DATE	
PROGRAM, CAMPUS	

স্বত্ব : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
নবম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৫
প্রকাশনায়: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল
গ্রাফিকস্ : স্বপন চন্দ্র ভৌমিক
মুদ্রণ : এম বি প্রিন্টার্স ২৮ টিপু সুলতান রোড,
ওয়ারী ঢাকা ১১০০
মূল্য : ৮০.০০ টাকা

ভূ মি কা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলেবেলা লেখাটি তৈরি করতে আমাকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিল আমার ছেলে অভী। বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখে সে আমাকে নানা প্রশ্ন করতো। আমার সীমিত জ্ঞান থেকে তাকে গল্প শোনাতাম। পরবর্তীতে এই ধরনের একটি বই লেখার জন্য আমি তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হই। বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়-স্বজনদের এবং পরিচিত জনদের মুখে তাঁর কথা শুনি। এরপর তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় দু'বার গিয়ে গ্রামীণ পরিবেশ, তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্থানগুলো ঘুরে দেখি এবং গ্রামের মানুষের কাছ থেকেও যতোখানি সম্ভব তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করি। সবাই আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মেজ চাচী হাজেরা বেগমের কাছ থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করি। বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরের স্ত্রী রাজিয়া নাসেরও আমাকে কিছু মূল্যবান তথ্য দেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছেও তাঁর বাবার কথা সব সময় শুনে আসছি। এই গ্রন্থের অধিকাংশ তথ্য তিনি কখনো গল্প আকারে শুনিয়েছেন, কখনও নিজে লিখে দিয়ে সহায়তা করেছেন। এই দেশ, গ্রাম, মাটি ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু কিভাবে তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন আমি তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে তার বড় হয়ে ওঠা, মন-মানসিকতা গড়ে ওঠা এবং তাঁর স্বভাবটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর শৈশবের কথা তাঁর দাদা-দাদীর মুখ থেকে শুনেছেন। তাই বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলার কথা এখানে গল্পাকারে সাজিয়ে লিখতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আর টুঙ্গিপাড়ার আশ্চর্য সবুজ শান্ত প্রকৃতি ও সরল পারিবারিক জীবন বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল তা আমাকেও যেন ছবির মতো স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। এদেশের মাটি ও মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা-দীক্ষা ও

জীবনব্যাপী সংগ্রামের সাহসী চেতনা তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেন। এখানে যতখানি সম্ভাব্য তথ্য পাওয়া গেছে তা তুলে ধরেছি।

লেখাটি প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্য সম্পাদক রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) এবং প্রফেসর আনিসুজ্জামান সম্পাদনা করে দিয়েছেন। শিল্পী হাশেম খান এই লেখার পেছনে অনেক পরামর্শ যুগিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহে বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাইয়ের ছেলে নজীব আহমেদ আমার সঙ্গে ঘুরেছেন। আমি এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এ লেখায় বঙ্গবন্ধুকে মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনরা যে নামে ডাকতেন ও সম্বোধন করতেন, তাঁর ভাই-বোনদের প্রকৃত নাম, অন্যান্য নামগুলো এবং গোপালগঞ্জের গৃহশিক্ষকের নাম সব সঠিক রাখা হয়েছে। সংগৃহীত ছবিগুলো শেখ হাসিনার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৪ বেবী মওদুদ

বি:দ্র: এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পর প্রায় আঠারো বছর হয়ে গেল। বর্তমানে সপ্তম সংস্করণে এসে কিছুটা সংশোধন ও নতুন করে লেখাও হয়েছে। শিশু কিশোরদের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য আমাকে এটা করতে হয়েছে। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শময় জীবনকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। পাঠকদের কাছে বইটি সমাদর লাভ করতে পারায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বেবী মওদুদ
২৮.০৪.২০১২

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০ শাহাদৎবরণ : ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫

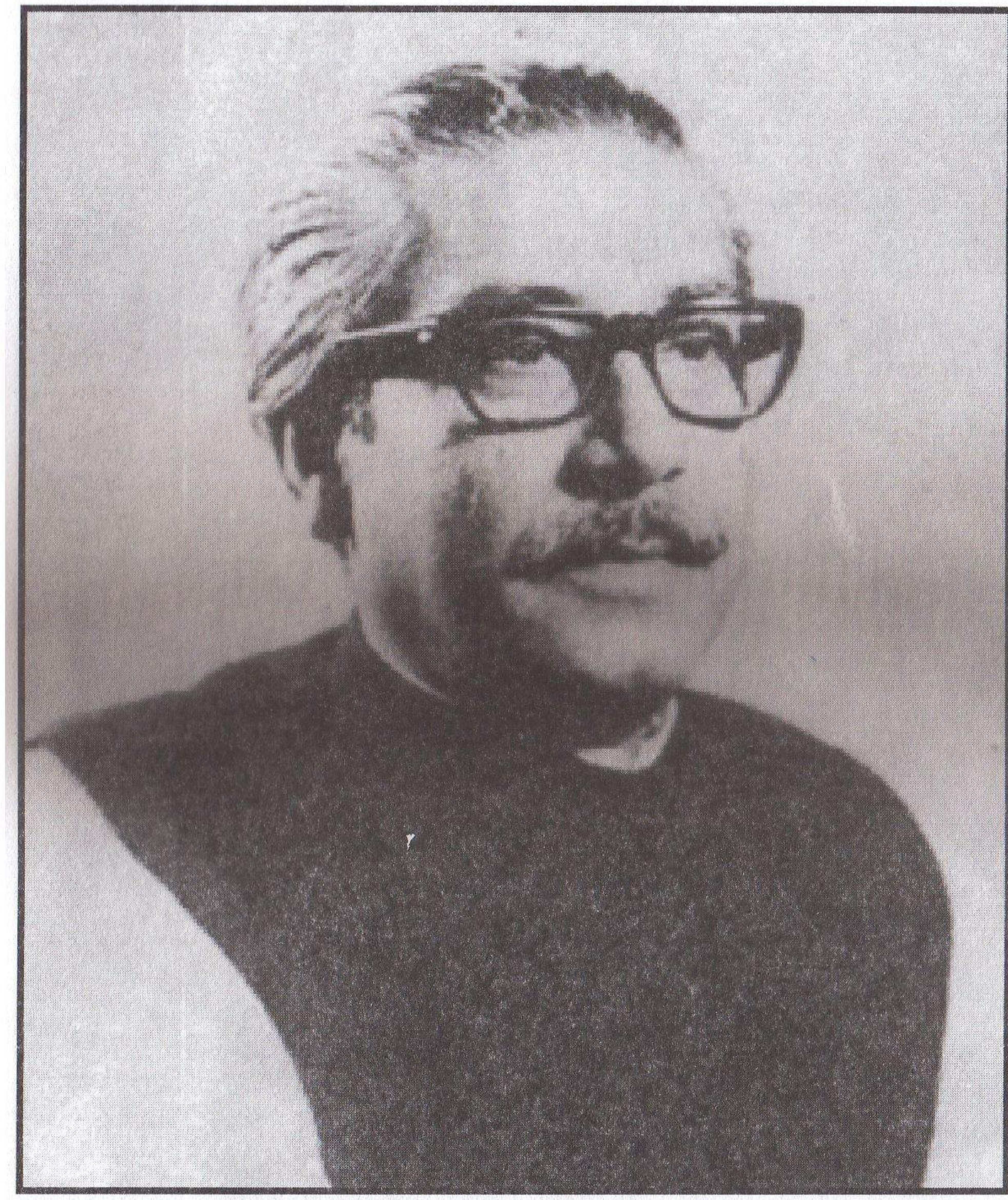

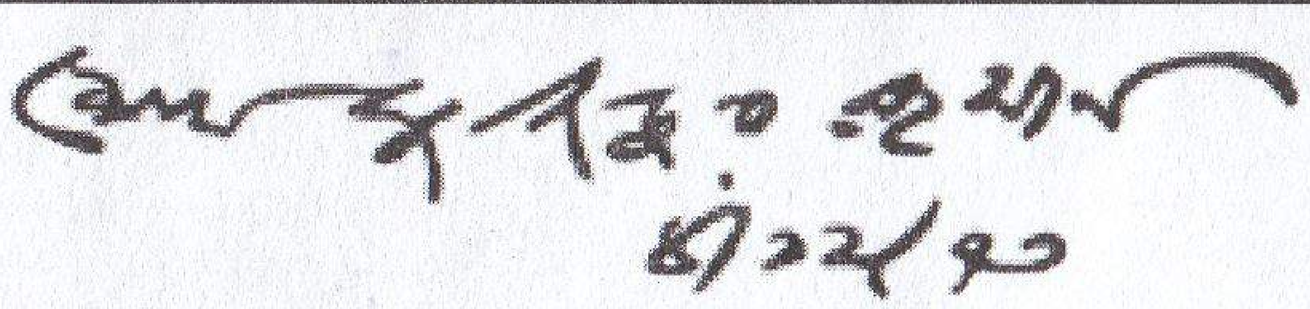

এক

তাল-নারকেল গাছের পাতার শর্ শর্ শব্দ বড় সুন্দর এখানে। তমাল শিরিষ হিজল বকুল কদম সজনে গাছের ঝিরি ঝিরি পাতার শব্দেও কেমন যেন একটা ছন্দ আছে।

মধুমতী নদী থেকে ভেজা বাতাস বয়ে আনে প্রকৃতির এই শব্দ আর গন্ধ ভালোলাগা।

একটা দুটো তিনটে পাখীর ডাক শুরু হয়। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো পাখীর একটানা কিচিরমিচির আওয়াজ ভেসে আসে। আর বড় লালঝুটি মোরগটা তো রাতের অন্ধকার ভেঙ্গে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ক-ক-ক-ক রবে তার প্রাত্যহিক ডাক শুরু করে দিয়েছে।

মায়ের ঘুম ভাঙে। ছেলের মাথা ভর্তি কালো চুলে তার নরম আঙ্গুল বোলান। বড় দু'মেয়ে বেগম ও ঠানডু পাশের চৌকিতে ঘুমুচ্ছে। মায়ের একপাশে দেয়ালের দিকে মুখ করে হেলেন ঘুমোচ্ছে। আর এক পাশে খোকা মায়ের কোলঘেঁষে ঘুমোয়। খোকার বয়স এবার পাঁচ হলো। পর পর দু'মেয়ে জন্মাবার পর চৈত্র মাসে খোকার জন্ম হলে সারা বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। খোকার নানা তো খুশীর চোটে হাকডাক করে মিষ্টি আনান। খাসি জবাই করে খাওয়া-দাওয়ার ধুম লাগিয়ে দেন। শেখ বংশে ছেলে জন্মায় কম। পর পর দু'মেয়ের জন্ম হলেও একটা ছেলের বড় স্বপ্ন ছিল মায়ের। আঁতুর ঘরে প্রথমে খোকার মুখ দেখে খুশীতে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বাড়ীর সবাই তাঁর কান্না দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে আর কারও কোন ছেলেমেয়ে হল না। তাঁর কোলেই প্রথম ছেলে জন্মাল-এ যে কত আনন্দের কত গৌরবের তিনি ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না।

পাশের চৌকিতে একবার মেয়েদের দিকে তাকান মা। খোকা কাল জিজ্ঞেস করেছিল,

ঃ মা, বাবা তো এবার বাড়ী এলেন না?

মা ওর বিষণ্ন মুখটায় চুমু খেয়ে বলেছিলেন,

ঃ তাতে কি হয়েছে, হয়তো কোর্টে জরুরী কাজ পড়েছে, তাই সময় পাননি।

এন্ট্রাস পাশ করেই গোপালগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টে চাকরি করেন বাবা শেখ লুৎফর রহমান। বাবার জন্য সপ্তাহ শেষের দিনটায় অধীর হয়ে অপেক্ষায় থাকে খোকা। বাড়ীর নৌকা ভেড়ার ঘাটটার কাছে হিজল গাছটার নীচে ঠিক সময়মত গিয়ে

দাঁড়ায়। বাবা দুপুরে রওনা দিলে সন্ধ্যা নামার মুহূর্তেই এসে পড়েন। অনেক নৌকার মাঝে বাবার নৌকা দেখামাত্র খুশিতে তার ছোট্ট মুখটায় একরাশ হাসি ছড়িয়ে যায়। বাবার সঙ্গে হাত ধরে ঘরে ফেরা, তার পর মনে মনে জমিয়ে রাখা সব প্রশ্ন এক এক করে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত থামতেই চায় না। বাবা হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলে খোকাকে তিনি দুই এক লোকমা ভাত মুখে তুলে খাওয়াবেন। সেদিন খোকা বোনদের সঙ্গে খুনসুটিও করে না, মায়ের কাছও ঘেষে না। বাবার মুখে শহরের গল্প শুনতে শুনতে একসময়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।

মা টের পান খোকার ঘুম ভেঙ্গেছে। তবু মা যতক্ষণ শুয়ে থাকবেন সে কোল ছেড়ে উঠবে না। খোকার এই ভালোলাগাটুকু তাঁকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। বাড়ীর কাছে মসজিদে আজান দিলে মা-কে উঠতেই হয়। নামাজ পড়ে, কোরআন শরীফ পড়েন কিছুক্ষণ। তারপর সংসারের কাজকর্ম শুরু করতে হয় তাঁকে।

খোকাও চোখ মুছতে মুছতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। উঠোনের বরই গাছটায় একঝাক চড়ুই তখনও একটানা কিচির মিচির ডেকে চলে। খোকা কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

ফালগুনের মিষ্টি সকাল। তাল গাছটায় একটা 'বউ কথা কও' পাখি সেই ভোর রাত থেকে ডাকা শুরু করেছে। আর যেন থামার নাম নেই। ওটাকে একবার খুঁজে দেখতেই হবে, মনে মনে ঠিক করে খোকা।

বাড়ীর লোকজন সবাই তখনও ঘুমিয়ে। ভোরের দিকেই ঘুমটা যেন জমিয়ে নামে। খোকার তবু ভোরে না উঠলে ভালোলাগে না।

মাকে পাকঘরে ঢুকতে দেখে খোকা উঠোনের পেছন দিকে তাল আর সুপারি গাছের সারির ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপর কচু আর জংলা গাছের লতা-পাতা জড়ানো ঝোঁপের ভেতর দিয়ে দেয় দৌড়। একেবারে সাঁকোর কাছে।

ভোরবেলার বাতাসের গন্ধই আলাদা। হালকা অন্ধকার জড়ানো আলো ফোঁটার সৌন্দর্য প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। ভেজা মাটি আর ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে দারুণ ভালো লাগে। ভাগ্যিস মা তাকে দেখেনি। তাহলে বলত, খোকা, খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে বেরোও।

সাঁকোর ওপারে নদীর ধার ঘেঁষে জেলেরা বসেছে সব ইলিশ, শরপুঁটি, কই, মাগুর, কাৎলা, রুই, বোয়াল আর ইচা মাছের ঝাঁকা নিয়ে। ঝিঙ্গে, পটল, বেগুন, কাঁচা মরিচের ঝাঁকাও বসেছে। দুধের ভাঁড় নিয়ে বসেছে কয়েকজন গোয়ালা। মহাজনরা সব কিনে লঞ্চে করে গোয়ালন্দ পাঠাবে। সেখান থেকে আবার যাবে কলকাতা, খুলনা। খোকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিড়-ভাট্টা দেখে। হাঁক-ডাক শোনে তারপর কলাগাছের বাগান ঘেঁষে মধুমতী নদীর পাশ দিয়ে সোজা বড় দিঘিটার কাছে চলে যায়।

দিঘির পারের বড় বরই গাছটায় নতুন পাতা গজিয়েছে। কি সুন্দর সবুজ সব পাতা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পৌষ-মাঘ মাসে এ গাছে এতো বরই ধরে যে তখন আর একটা পাতাও চোখে পড়ে না। শুধু বরই আর বরই। বড় বুজি আর

মেজ বুজির সঙ্গে ডাল ঝাঁকিয়ে বরুই কুড়িয়ে খাওয়ার মত মজা আর বুঝি কোন কিছুতেই পাওয়া যায় না।

খোকা দেখে পুকুর পারে পুঁতে রাখা বাঁশের ডগাটার উপরে আজও মাছরাঙ্গাটা বসে আছে চুপচাপ। স্থির চোখে পানির দিকে চেয়ে আছে। মাছরাঙ্গাটাকে দেখেই খোকার মন ভরে যায়। চুপ করে কিছুক্ষণ দেখে পাখিটার মাছ ধরা।

হাফ হাতা পাতলা গেঞ্জি গায়েই চলে এসেছে খোকা। ভোরবেলায় নদী থেকে ভেসে আসে ভেজা ভেজা বাতাস। শরীর শির শির করে। খোকা তবু মাছরাঙ্গাটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গত দু'দিন এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। মাছ ধরা আর দেখাই হয়নি। আজ দেখতেই হবে। না হলে ঐ বাঁশের কঞ্চিটা উঠিয়ে ফেলবে। কেমন একটা জিদ ধরে যায় খোকার। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক সাদা বক ডাকতে ডাকতে চলে যায় মাথার উপর দিয়ে। সাদা রংটা খোকার খুব পছন্দ। তবে এতো সুন্দর সাদা ও আগে কখনও দেখেনি। দু'চোখ যেন আলোয় জুড়িয়ে দিয়ে যায়।

বকগুলো সব সময় দেখা যায় না। কোথায় যে ওরা থাকে, আর কোথা থেকে আসে।

ভাবতে ভাবতে মাছরাঙ্গাটার দিকে যেই তাকিয়েছে আর কী ভীষণ মজা! ঠিক তক্ষুনি মাছরাঙ্গাটাও টুপ করে শব্দ তুলে একটা ছোট্ট মাছ ধরেছে দু'ঠোঁটের ফাঁকে। খুশীর চোটে হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হাসতে থাকে খোকা।

তার পর ছুট ছুট, সোজা বাড়ীর দিকে। এমন মজার দৃশ্যই কেউ তো দেখলো না। এখন না শোনালে মজাটাই সম্পূর্ণ হবে না, সবাই তো ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

দুই

খালপারে বসে হাত মুখ ধুয়ে খোকা মৌলভী সাহেবের কাছে পড়তে বসে। খালাত ফুপাত-চাচাত-মামাত সব মিলে প্রায় তেরোজন এক সঙ্গে সুর করে আমপারা পড়ে।

বাইরে তখন সূর্য সবে তার ভোরের রোদ্দুর ছড়িয়েছে মাত্র। নতুন ফুল-ঘাস-লতা-পাতায় সেই কুসুম রোদ্দুর নানা রং ঝরাতে থাকে। মৌলভী সাহেব সবাইকে ছুটি দেন পড়া থেকে। দলবেঁধে সবাই হৈ চৈ করে বাড়ীর ভেতর বড় উঠোনটায় জমা হয়। তারপর যার যার ঘরে গিয়ে ঢোকে। খোকা বড় দুবোনের সঙ্গে মায়ের কাছে পাকঘরে গিয়ে বসে।

জলচৌকি পেতে মা বসতে দেন, খাবার দেন। লাল চিঁড়া ভেজা, নারকেল কোরা, চাঁপাকলা, সরভাসা ঘন এক বাটি দুধ আর খেজুরের গুড়।

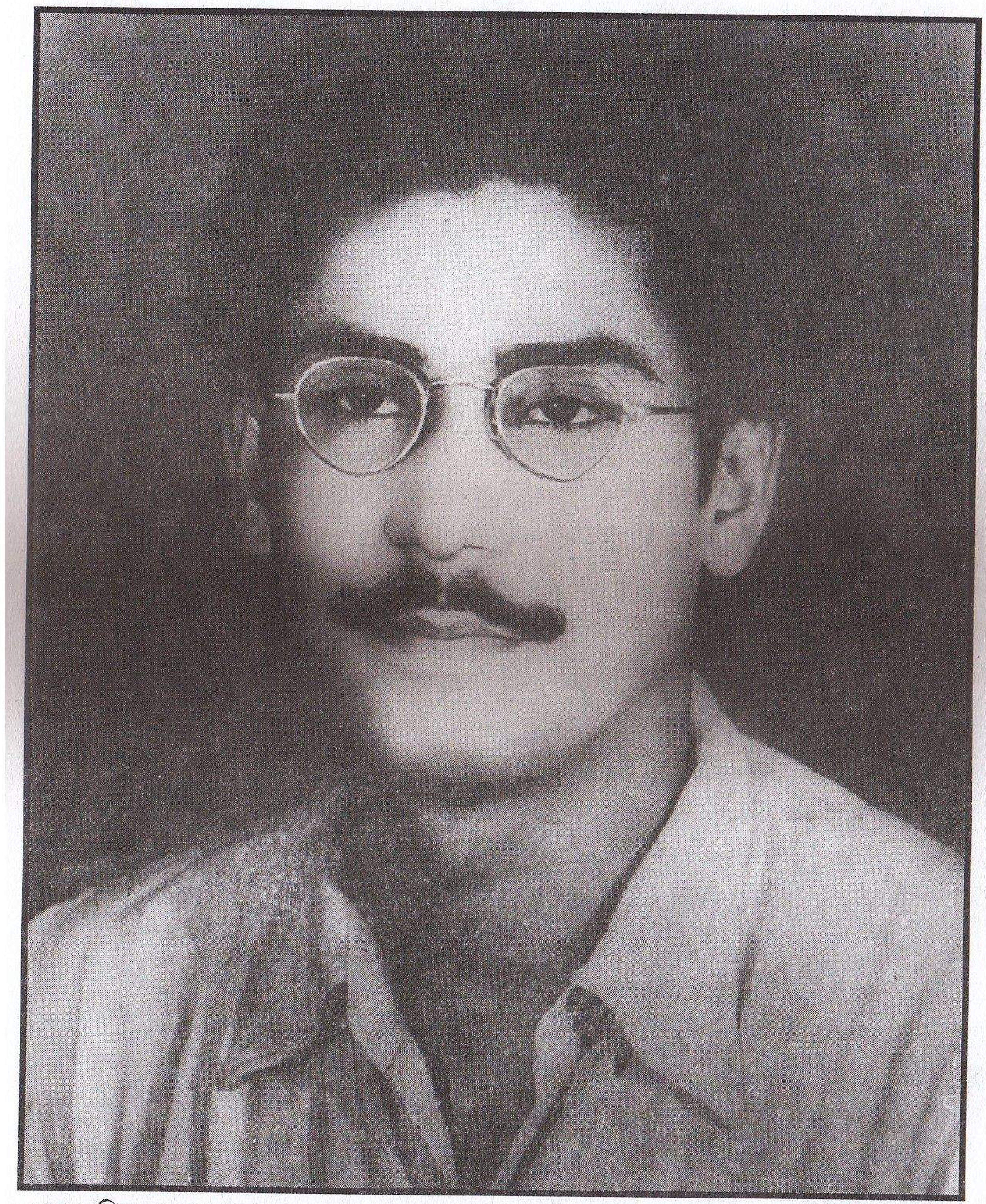

শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালে ছবি : সংগৃহীত

মায়ের হাতে বাটিতে মাখন। খোকা আড়চোখে চেয়ে মাখনের পরিমাণ দেখে ভাবে, তাহলে আজও মাখন তৈরী হয়েছে। মা যে কী! রোজ রোজ মাখন খেতে বুঝি ভালো লাগে!

না খেতে চাইলে মা বলে, রোগা-পাতলা শরীর, একটু মাখন খেলে শক্তি হবে। মা আজ নিজের হাতে একটু একটু করে চিনিমাখা মাখন খাওয়ায়। মা সামনে না থাকলে খোকা নিজের হাতে যতটুকু না খাবে, তারচেয়ে বেশী ছড়াবে, একে ওকে খাওয়াবে। বকলে চুপ করে থাকবে। তারপর উত্তর দেবে,

ঃ বারে, আমি একাই সব খাব, আর ওরা চেয়ে চেয়ে দেখবে বুঝি?

ছেলের কথা শুনে মায়ের বুক ভরে যায়। এই বয়সেই খোকা শুধু নিজের বলে কিছু ভাবে না। বোনদের আর বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও সব আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পছন্দ করে। সবাই তাকে মানেও বেশ।

সকালের খাওয়া শেষ হলে সবার সঙ্গে খোকাও বই শ্লেট নিয়ে বাইরের ঘরে মাষ্টার সাহেবের কাছে পড়তে বসে। ক'দিন হল নতুন মাষ্টার এসেছেন নোয়াখালী থেকে। পন্ডিত সাখাওয়াৎ উল্লাহ্। তিনি বাংলা ও অংক শেখান ভারী যত্ন করে। শেখ বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা তাঁর সামনে বসে সুর করে বর্ণমালার ছড়া ও নামতা পড়ে।

খোকার সঙ্গে ছোটবোন হেলেনও এসে বসে এখন। বাংলা অংক শেখানোর পর পন্ডিত সাহেব ইতিহাসের গল্প শোনান। দেশের কথা, হযরত মোহম্মদ (দ.) ও চার খলিফার মহানুভবতা, তারপর গৌতম বুদ্ধের কথা। কখনও রাম-রাবণ যুদ্ধের কাহিনী। প্রতিদিনই তিনি পড়াশেষে একটা গল্প শোনান। এই গল্প শুনতে ছেলেমেয়েরা বেশী ভালোবাসে।

বেলা একটু গড়ালেই ছুটি। ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করতে করতে যে যার ঘরের পানে ছোটে। বই শ্লেট ঘরে রেখে গামছা নিয়ে সবাই খালপাড়ের ঘাটে। কে কার আগে ঝাঁপ দেবে তার প্রতিযোগিতা চলে। স্কুল ছুটির দিন এই পানিতে ঝাঁপঝাঁপি, শাপলা তোলা, মাছ ধরা, সাঁতার কেটে দূরে যাওয়া ইত্যাদি চলে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু স্কুল খোলার দিন আতিয়ার অথবা জয়নাল তাড়া লাগাবে,

ঃ ও মিয়া ভাই মা ডাকতিছে। স্কুল যাতি অবে না।

ঃ আরে থামো থামো। আর একটু সাঁতরে নেই। ছেলের দল তাদের থামিয়ে দেয়।

তবু একসময় উঠতেই হয়। স্কুলের মজাটাও তো কম নয়। সেখানেও বন্ধুরা আছে আর ঠিকমত স্কুলে না গেলে বাবাকে মা বলে দেবে। বাবা তো বকবেন না। শুধু বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে খোকার দিকে তাকালে কোন উত্তর দেয়া যাবে না। বাবা রাগ করলে খোকার মনটাই কী ভালো থাকবে!

ভাত খেতে বসে খোকা। মা পাতে ঢেঁকি ছাটা লাল চালের ভাত তুলে দেয়। কি সুন্দর গন্ধ ভাতের। ধোঁয়াও উঠছে। বড় বুজি দু'চামচ ঘি ছড়িয়ে দেয় ভাতের উপর। মা লবণ দিয়ে ভাত মাখিয়ে দেয়। বেশ বড় একটা কই মাছ ভাজা তুলে দেয়। খোকা মাছটাকে আঙ্গুল ছুঁয়ে দেখতে থাকে ভালো করে।

মা ও ঘরে গিয়েছিলো কি যেন আনতে। বড় বুজি বলে ওঠে,

ঃ ও মা তোমার খোকার মাছের কাঁটা বাছতি হবে।

খোকা মৃদু হেসে একবার বুজিকে দেখে, তারপর ঘি মাখা ভাত খেতে শুরু করে।

মা ভাত ঠান্ডা করার জন্য পাখা আনতে গিয়েছিলো। বুজিকে বাতাস করতে দিয়ে মাছের কাঁটা বেছে দেয় ছেলেকে। মা কত কথা বলে। সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। মাস্টার সাহেবকে সম্মান করবে। খোকা তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠে। আজ একটু আগে বেরুতে হবে। পথে কালিপদ ও আরও দু'জনের বাড়ী হয়ে যেতে হবে।

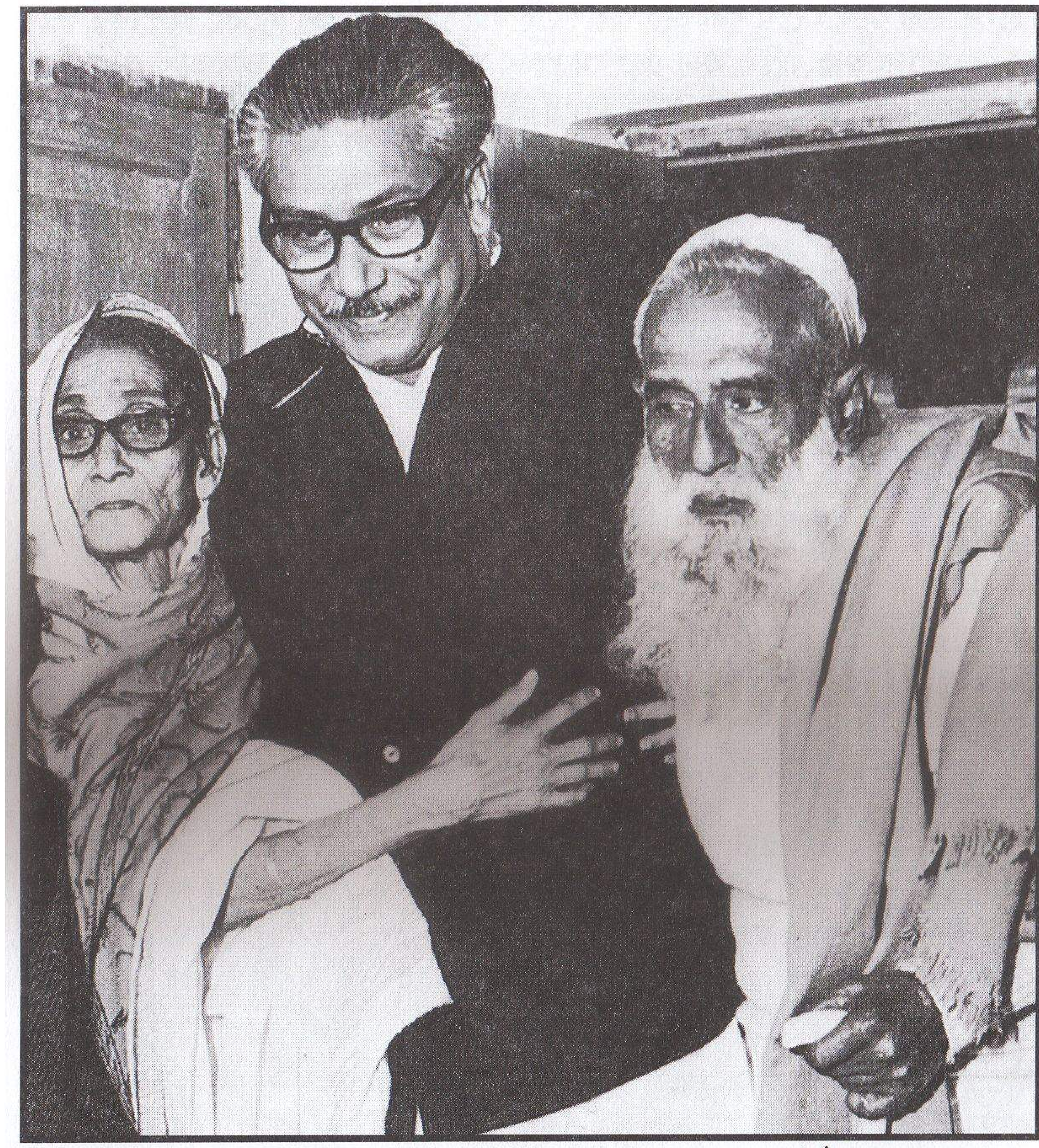

বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা সায়েরা খাতুনের সঙ্গে। বড় হয়ে উঠলেও খোকা বাবা-মাকে কাছে পেলে যেন শিশু হয়ে উঠতেন ছবি : সংগৃহীত

তিন

বাড়ীর সামনের দিকটায় ঘাট। সেখানে ছোট-বড় নৌকার ভিড়। সাঁকোর পাশে লঞ্চ-ঘাট। সেখানে ছোট ছোট লঞ্চ ভিড়ে থাকে। ঘাট পারের পথটা ধরে যাওয়ার একটুও মজা নেই। তার চেয়ে বাড়ীর পেছনের বাঁশ-ঝাড়, লতা-পাতার ঝোঁপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বড় পুকুরের পাশ ঘেঁষে, ধান ক্ষেত-পাট ক্ষেতের আল ধরে

দু'টো গ্রাম পেরিয়ে পাটগাতি স্কুলে যাওয়ার পথই খোকার পছন্দ। একসঙ্গে সাত আটজন দলবেঁধে যায় ওরা।

মাদারীপুর থেকে খোকার দুই ফুপাত ভাই তাঁরা ও রাজা এসেছে। তাঁরা কাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আজ থেকে সেও ওদের সঙ্গে যাবে। তাঁরা ক'দিনেই খোকার বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছে। খোকাকে ছেড়ে একটুও নড়তে চায় না।

পাটগাতি বাজারের পাশেই গিমাডাঙ্গা স্কুল। এই স্কুলটা ছোট দাদা করেছেন। আশে পাশে আর কোথাও এতো বড় স্কুল নেই। এখানে ইংরেজিও পড়ানো হয়। বাজারটা বেশ বড়। টুঙ্গীপাড়া ও তার আশেপাশের সব গ্রামের প্রধান হাট-বাজার কেন্দ্র এটা। দূর দূর থেকে বড় বড় লঞ্চ স্টিমার নৌকা এসে ভেড়ে এখানে। কেনাকাটা চলে দিন রাত। হাটের দিন মানুষের ভিড় আর ধান-পাট, গুড়, মাছ সবজির ঝাঁকায় চারদিক গম গম করে। স্কুল ছুটি হলেই খোকা বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে চলে আসে। অনেক্ষণ ঘুরে বেড়ায়ে। কত রকম মানুষের ভিড় আর সারি সারি সাজানো পণ্যের পসরা দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ক্লাসে বই-শ্লেট রেখে খোকা পাশের ক্লাশে তাঁরার কাছে যায়। তাঁরা এক ক্লাশ নীচে পড়ে। অন্য ছেলেরা তাঁরাকে নিয়ে কৌতুহলী প্রশ্ন করছে। বেচারা লাজুক চোখ তুলে একটা দু'টো কথা বলছে, তবে বেশ চালাক আর চটপটে। তাঁরার এই চটপটে স্বভাবের জন্য খোকার ওকে বেশি পছন্দ।

প্রথম ক্লাশ হল বাংলা। এখন আর বানান করে পড়তে হয় না। একটানা গড় গড় করে দ্রুত পঠন শোনেন মাস্টার সাহেব। উচ্চারণ ভুল হলেই শাস্তি। কানধরে দাঁড়াও, নয়তো হাঁটুগেড়ে বসো। একজন একজন করে উনিশজন। সবার পড়া শোনা হলে মাষ্টার মশাই শ্রুতিলিখন দেন। শ্লেটে লিখতে হয়। সেখানেও বানান ভুল হলে শাস্তি।

বাংলা কবিতা মুখস্ত শোনাতে বেশি ভালোলাগে খোকার। কবিতার কথাগুলো শোনাতে শোনাতে যেন একটি একটি করে ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কেমন যেন একটা ছন্দ জড়িয়ে থাকে।

বাংলা পড়া শেষ হলেই অংক। অংক করতে খোকার একটুও ভালোলাগে না। তবে ঐ সুর করে নামতা পড়া খুব পছন্দ। মাষ্টারমশাই তিন ঘরের পর আর শেখান না। রোজ রোজ ঐ এক-দুই-তিন ঘর পর্যন্ত শোনেন তিনি।

আজ স্কুল ছুটি হলে মাঠে অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করে খেললো ওরা। বড় ক্লাশের ছেলেরা ফুটবল হাডুডু খেলে। ছোটরা ছুটোছুটি করা ছাড়া আর কিছুই খেলতে পারে না।

বই-শ্লেট হাতে খোকা তার বন্ধুদের নিয়ে পাটগতি বাজারের পেছনে নদীর ধারে বড় জারুল গাছের তলায় এসে পানিতে পা ডুবিয়ে বসে। বেশ ছায়া ছায়া জায়গাটা। ঘাটে কয়েকটা নৌকা বাঁধা আছে।

ওদেরই সমবয়সী একটি ছেলে নৌকায় বসে ভাত খাচ্ছিল। খালি গা, পরনে একটা

লাল-নীল চেক লুঙ্গি। কী কালো গায়ের রং ছেলেটির। মাথার কালো চুলের চেয়েও কালো। চাঁদ ও তারার আলোহীন অমাবশ্যার রাতের মতো কালো।

অথচ কী শক্ত শরীর। চোখ দুটো বেশ বড় বড়। ছেলেটি শুধু একটা পেঁয়াজ আর মরিচ দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছিল। সবশেষে পানি খায় ঢক ঢক করে।

খোকার বন্ধুরা ভূতের গল্পের আসর বসালো সেই জারুল গাছটার তলায়। একজন গল্প বলছিল আর অন্যেরা শুনছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। খোকার ওসব ভুত টূতের গল্প পছন্দ নয়। যা বাস্তব নয়, চোখে দেখা যায় না, শুধু শুধু তা শুনে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। তারচেয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকা অনেক ভালো।

ওদের বলা আর শোনার আগ্রহ দেখে খোকা বাধা দিল না। দূরের নদীর পানিতে তখন দুপুর শেষের রোদ্দুর পড়ে ঝিলিমিলি খেলছে। দূরে দূরে ছোট্ট ছোট্ট নৌকা। কোনটার সাদা পাল, কোনটায় লাল, সবুজ, নীল, হলুদ। কতদূরে যায় নৌকাগুলো? কোন দূরের দেশে? খোকাও কি কোনওদিন সেই দেশের কোথাও যাবে? অমন একটা সুন্দর পাল তোলা নৌকায় চড়ে। হঠাৎ শুনতে পেলো মিষ্টি বাঁশির সুর। অবাক চোখে চেয়ে দেখে সেই কালো সুন্দর চেহারার ছেলেটা নৌকার গোলুইতে শুয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। ভুতের গল্প শুনতে শুনতে ততক্ষণে তার কাছে এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। খোকা থামিয়ে দিল ওদের। সবাই এবার কান পেতে সেই বাঁশির সুর শুনতে লাগলো। নদীর বাতাস ছিল বড় ধীর, শান্ত। মনে হলো পাখির শিস, পাতার শব্দ সবকিছুর চেয়েও এই সুর অনেক মধুর। কেমন আবেশ ছড়িয়ে রাখে। কেমন করে বাজায় ছেলেটা? ওর কী এমন শক্তি আছে?

বাঁশির সুর একসময়ে থামে। ছেলেটা বাঁশি রেখে নৌকার পাটাতনের নীচে জমা পানি নারকেলের মালায় সেঁচতে থাকে।

খোকার দল ওর কাছে যায়।

ঃ এই তোর নাম কি রে?

ঃ গৌতম ! সজীব কণ্ঠ।

ঃ গৌতম - গৌতম।

খোকার সেই মাষ্টার সাহেবের কাছে শোনা ইতিহাসের গল্প মনে পড়ে যায়।

গৌতমবুদ্ধ তো রাজা ছিল। বিরাট দয়ার হৃদয় ছিল তাঁর।

ঃ কোথায় বাড়ী তোদের?

ঃ হই চিংগাড়ী। ছেলেটা আঙ্গুল দিয়ে দিক দেখায়।

ঃ কার কাছে শিখলে বাঁশি বাজানা?

ঃ কারো কাছেই না। বাবার ছিল এইটা এওন আমি বাজাই।

আর কোন কথা হয় না। ছেলেটা আপন মনে পানি সেঁচার কাজ করতে থাকে। তাঁরা এবার হাত ধরে টানে।

ঃ ও মিয়াভাই, চলো বাড়ী যাই। আমিনুদ্দিন খুঁজবে নে।

এবার আর ঝোঁপঝাড় নয়, ধানক্ষেত নয়, নদীর পার দিয়ে ওরা বাড়ীর পথ ধরে। দুপুর শেষে রোদ বেশ চড়া। বড় ক্লান্তি নামে। ক্ষিধেয় পেট চিনচিন শুরু করেছে। দু'জনে কখনও দৌড়ে কখনও হেঁটে বাড়ী পৌঁছে যায়। দালান বাড়িটার পেছন দিকটায় চোখ পড়ে তাঁরার।

ঃ ও মিয়া ভাই দেখ, গাছ ভরা জাম্বুরা কত। বিকালে বল খেলা যাবে নে।

ঘরে ফিরেই বই-শ্লেট রেখে খোকা মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। মা সুঁই সুতো দিয়ে সেলাই করছিলো। সেটা রেখে ছেলের মাথায় হাত বুলোয়।

ঃ কি বাবা ক্ষিধা নাগছে? ওঠ ভাত দেই।

ঃ তুমি খাওয়াইয়া দিবা কও।

ঃ ছেলের আব্দার শুনে মা মৃদু হাসে।

ঃ আচ্ছা দিবানে। ওঠো দেখি আমার বাজান।

চার

আজ স্কুল ছুটি। বাইরে ঝকঝকে রোদ্দুর। এবার বেশ গরম পড়েছে। খোকা উঠানে এসে বসতেই গোলাঘরের চাল থেকে লাফ দিয়ে এসে নামলো পোষা বানরটা। খোকার গা ঘেষে দাঁড়ায়। খোকা ওর মাথায় হাত রেখে বলে,

ঃ কি চিকিমিকি কলা খাবে?

মিকি খোকার আদর বুঝতে পেরে শুধু মাথা নাড়ে, খুশিতে হাত তালি দেয়। খোকা হেলেনকে বলে কলা আনতে। হেলেন এক ছড়া কলা এনে তার হাতে দিয়ে বলে,

ঃ নাও এরপর চাইলে মাকে বলতে হবে।

খোকা খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে,

ঃ তুই থাকতে, আবার মাকে বলব কেন? আমার চিকিমিকি, ভুলু আর পায়রাগুলো সব দেখাশোনার দায়িত্ব তোর। আমি বাড়ি না থাকলে তুই দেখবি। তারপর বড় হয়ে গেলে তখন যা চাইবি, তাই পাবি।

হেলেন বলে,

ঃ মিয়াভাই, ইস তুমি সেদিন দু'পয়সা নিলে যে সেটা কই?

A-98729

* Northern University Bangladesh * NUB Library

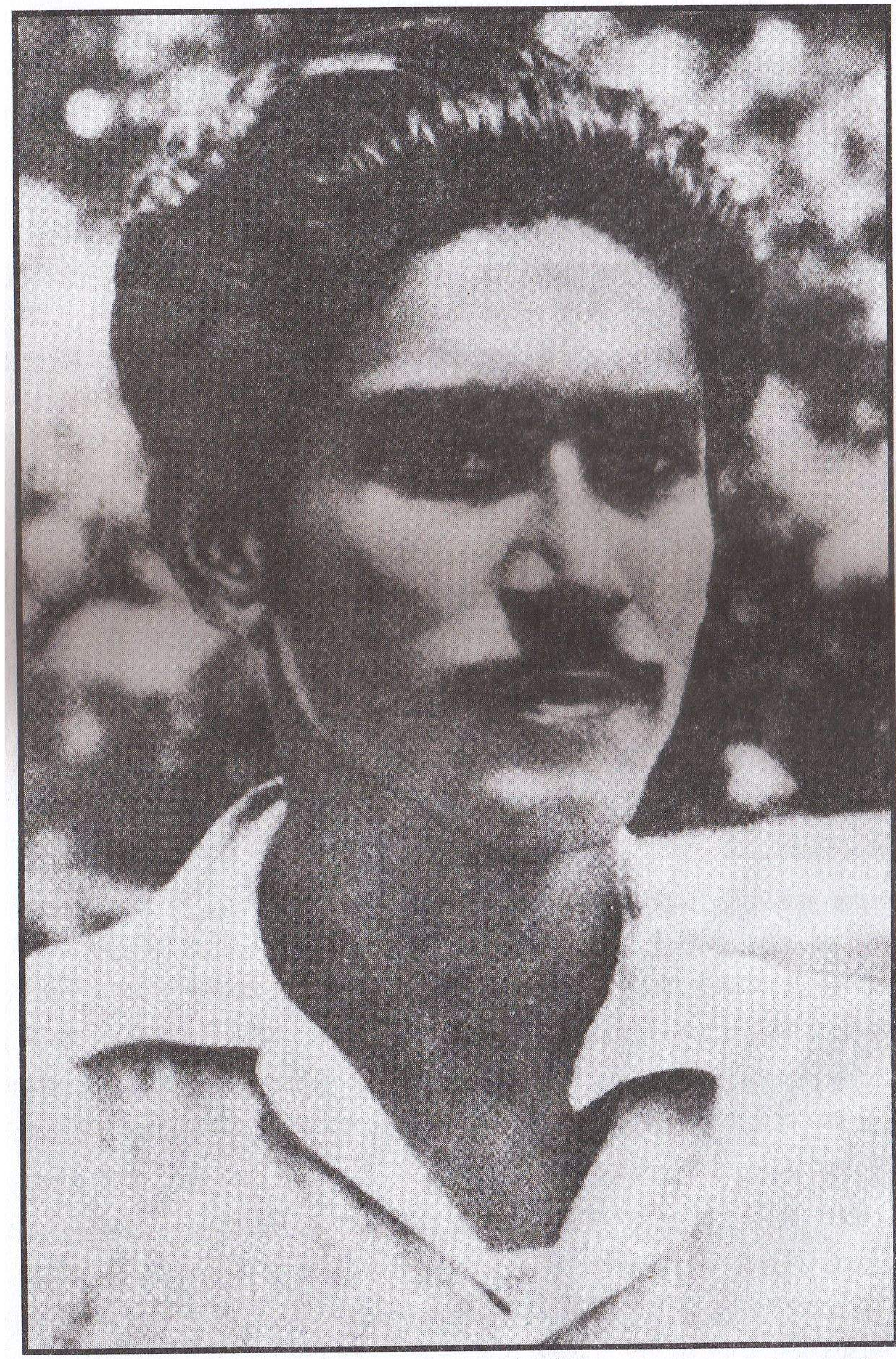

টুঙ্গিপাড়ার খোকা, তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব ছবি : সংগৃহীত

খোকা হাসে,

ঃ একদিন সব ফেরৎ দেব। দাঁড়া না আমি বড় হয়ে নেই, সব শোধ করে দেবনে, কি চাই তোর বল? সব হিসাব করে ফর্দ বানিয়ে রাখবি কেমন?

হেলেন হাসে,

ঃ হ্যাঁ, তুমি কবে বড় হবে, আমি সেই অপেক্ষায় এখন থেকে দিন গুণি আর কি!

খোকার পাশে তখন ভুলুও এসে বসেছে। খোকা তার মাথায় চাট্টি মারতে মারতে বলে,

ঃ হ্যাঁ গুণতে থাকনা। একদিন তো বড় হবই। তখন দেখিস তোর সব চাহিদা মিটায়ে দেব।

বিকালে সাঁকো পার হয়ে ওপারে বড় মাঠটায় যায় সবাই, ফুটবল খেলা দেখতে। নদীর ধার ঘেষেঁ নারকেল, তাল, সুপারির সারি। ছাতিম গাছের বড় বড় পাতার নীচে বসে খোকা ও তার সঙ্গীরা। দু'দলই বেশ শক্ত। কেউ কাউকে গোল দিতে পারল না। গোল না হলে সে খেলার কোন মজাই নেই।

নদীর পাড় ধরে হাঁটতে ওরা অনেকদূর যায়। রোদ ফুরোতে শুরু করেছে। দিনের ক্লান্তিও ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। নদী থেকে ভেসে আসা ভেজা বাতাস আজ বড় চঞ্চল।

খালের পানিতে হাত-পা ধুয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নামলো। মাষ্টার সাহেব গোপালগঞ্জ গেছেন, তাই আজ আর লেখাপড়া নেই। মা এক বাটি দুধ দিলেন। খোকা তাতে এক মুঠ মুড়ি ভেজালো। আজ বোধহয় কালো গুরুর দুধ। খুব সুন্দর গন্ধ।

বাড়ীর ভিতরে বড় উঠোনটায় মাদুর বিছিয়ে পিড়ি পেতে মা-খালা, চাচী-ফুফু-মামী-রা সব গল্প জুড়েছেন। নানী-দাদীরাও পান সুপারীর বাটা কাছে নিয়ে বসেছেন।

বাড়ীর সব ছেয়েমেয়ের দল মেজ চাচীকে ঘিরে বসেছে। ছোট্ট মতন মেজ চাচী বাড়ীর সব ছেলেমেয়ের খুব প্রিয়। তাঁর হাতের পিঠা-পুলি, খেজুর রসের পায়েস, নারকেলের নাড়ু আর আচারের কোন তুলনাই হয় না।

খোকা তার ছেলের দল নিয়ে মেজ চাচীর কাছে ঘেঁষে বসে।

ঃ ও চাচী, ঐ দালান বাড়ীর গল্প শোনাও না।

ঃ আর কত শোনামুরে বাপ।

ঃ শুরু থেকে কও চাচী, আবার শুনুম। মেজ বুজি বলে।

মেজ চাচী মিটি মিটি হাসেন। তারপর বেশ গল্পের ঢংয়ে বলে চলেন-অনেক অনেক বছর আগে। সেই ১৮৫০-৫৬ সালের কথা। সেটা ছিল নীলকর সাহেবদের আমল। বিদেশ থেকে এক শেখ আসলো। এখানকার নদী -খাল, গাছপালা, ফসল, মানুষ সব তার যখন পছন্দ হলো এখানটায় বসতি গড়লো। সংসার পাতলো। জমিজিরেত করে তা দেখাশুনা করতে লাগলো। তাদেরও বংশধর

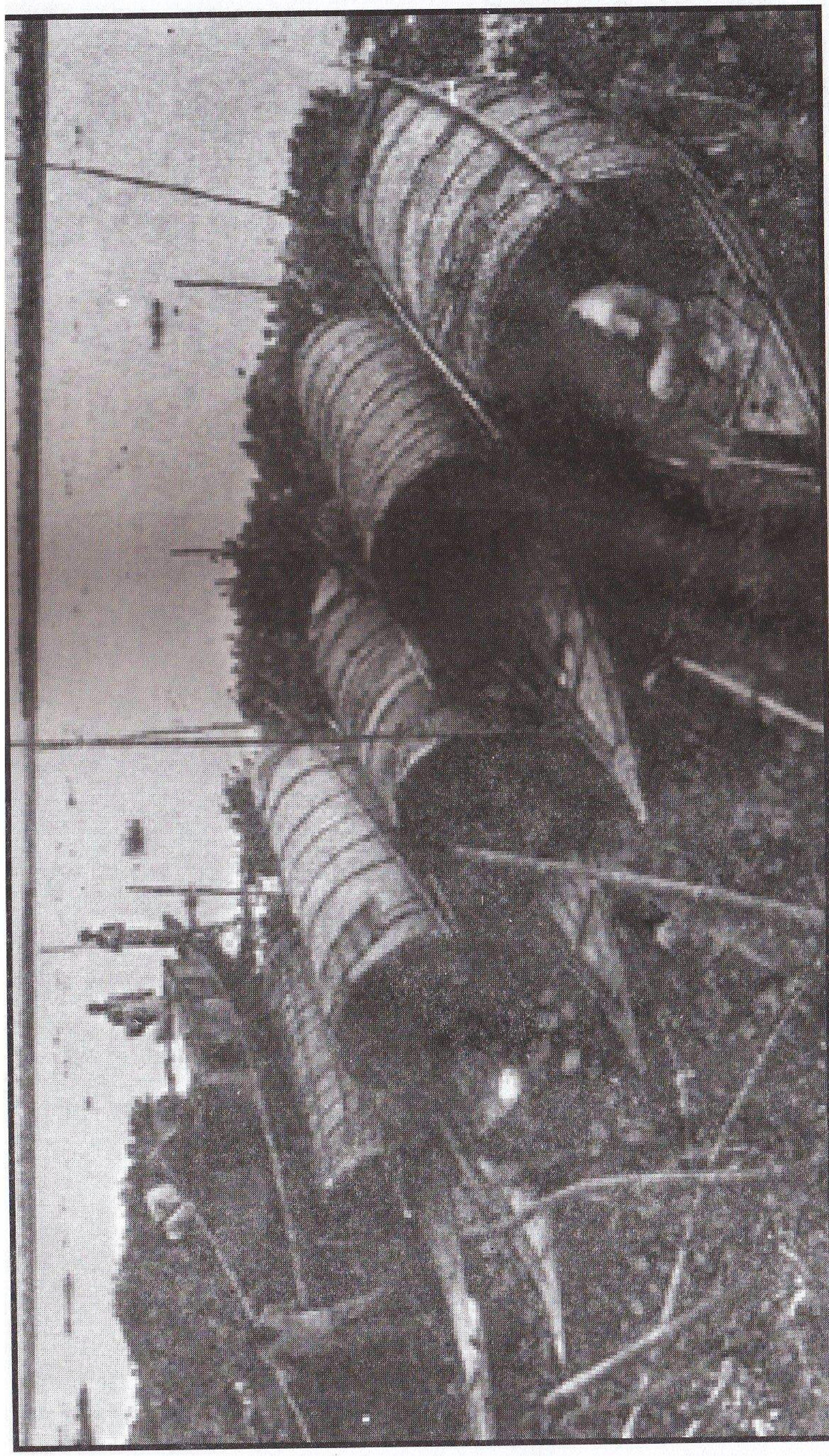

পাটগাতি বাজারের নদীর ঘাটে প্রতিদিন অসংখ্য নৌকা এসে ভিড়ে। নদী নৌকা আর মানুষ সম্পর্কে খোকার কৌতূহল গড়ে উঠে ছবি : পাভেল রহমান

বাড়লো। তখন কলকাতা শহর হয়ে গেছে। ইংরেজরা এদেশে শাসন আর ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে। এখানকার ফসল সেই কলকাতা যায়। শেখরাও দু'এক ভাই ব্যবসা শুরু করে।

কলকাতা থেকে একদিন এক বড় রাজমিস্ত্রী আনা হল। সেই মিস্ত্রী এই দালানের নকশা তৈরী করে। তারপর সুন্দরবন থেকে ভালো কাঠ কিনে আনা হলো। কলকাতা থেকে এলো ইট বালু লোহা চুন রং। আরও অনেক মিস্ত্রী আসলো বাইরে থেকে। এখন যে দালান দেখতেছ এইটার তলায় বিছান আছে ভারী কাঠের তক্তা। তারপর এক বছর ধরে এই দালান বানাইছে। আমার নানীর কাছ শুনছি, কত মানুষ আইসে খাড়ইয়া খাড়ইয়া এই দালান তৈরী দেখছে। পাটগাতি বাজারে যারা বাণিজ্য করতি আসতো, বেচা-কেনা করতো, তারাও এইখানে আইসা এই দালান তৈরী দেখতো। এই টুঙ্গিপাড়া, পাটগাতি কোন খানেই আর দ্বিতীয় একটা দালান তখন ছিল না। গোপালগঞ্জ শহরেও দালান ছিল আঙ্গুলে গোণা।

ঃ ও চাচী, আপনিও, গেছিলেন দেখতি? কে যেন বলে।

ঃ দূর ছেমড়ি। কথা কস কেন মাঝখানে? আমি ক'লাম কবনা আর

ঃ না চাচী, লক্ষী চাচী, সোনা চাচী, কন চাচী। সবাই চাচীকে সাধে।

ঃ শোন তবে। দালানের নকশা দেখছিস। কেমন ইট ভাইঙ্গা গোল কইরা বাড়ির খিলান বানাইছে। তার খোপে খোপে কবুতর বানাইয়া কত যতন কইরা কেমন সুন্দর রং আঁকিছিল। আমরাও ছোটকালে ঐ কবুতর গুলা তাকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম এই বুঝি উড়ে যাবেনে।

বলতে বলতে চাচী নিজেই হেসে কুটি কুটি। তার সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলেমেয়েরাও।

ঃ চাচী সাহেবগো তুমি দেখছ?

ঃ না, আমি দেখুম কেমনে। শোন্ সাহেবরা এই দেশটাই শাসন করা শুরু করলো। আমাদের জমিদার ছিল কলকাতায়, রাসমনি দেবী। সবাই তারে রাণী ডাকতো। আমরাতো তাঁর প্রজা ছিলাম, তাঁরে খাজনা দিতাম, তাঁর হুকুম মান্য করতে হতো। রাণী যেদিন মারা গেল, কি শোকটা না হয়েছিল। আমাদের শেখ বাড়ীর বড় মিয়াও কলকাতায় গেছিলেন। তা, ইংরেজরা খুব ঠেঁটা ছিল। নীলচাষ করার জন্য খুব জোরাজুরি করত। এইসব ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েও আমাদের বাড়ীর মিয়াদের সঙ্গে ঝগড়া-তর্ক লেগেই থাকত। একবার তো কলকাতায় কোর্টে মামলা হয়ে গেল ভীষণ। মামলায় শেখরা জিতলে সাহেবদের জরিমানা করা হল। শেখরা করলো ফন্দী। সোজা দাবী করে বসলো আধ পাই পয়সা জরিমানা দেয়া লাগবে। সবাই তো অবাক! আধ পয়সা হয় নাকি? এক পয়সা দুই পয়সা তিন পয়সা হতে পারে, আধা পয়সা তো হয় না। শেখরাও শোনে না। তাদের এক কথা আর জেদ্ ঐ আধ পয়সা দেবা, না হলি বান্ধা থাকো। ব্যাস ইংরেজ ব্যাটা তো দেবার পারলি না, সেই থেকে বান্ধাই থেকে গেল।

ঃ ও চাচী, দালান বাড়ীর কথা কও না।

ঃ আর কত কমু? ঐ বাড়ীতে দেখছ, ঘরগুলো কেমন ছোট্ট, কিন্তু জানালা-দরজার পাল্লা সব কেমন নকশাদার। তোর বাপও ঐখেনে জন্মেছে। মাও ঐখেনে জন্মেছে। বিয়ার পর এই পূর্ব দিকে নতুন ঘর তুলে আমরা এখন থাকি।

ঐ দালানের সামনের দিকে ঘরে থাকতেন লাখনৌ-এর এক মৌলভী সাহেব। যা সুন্দর সুর কইরা কোরান শরীফ পড়তেন। আমরা ঘরের ভেতর জানালা ফাঁক করে শুনতাম। আমরা ছোটকালে ঐ দালানের ছাদে বসে চুল শুকাতাম, আচারের জন্য আম কাটতাম। জ্যোৎস্নারাতেও ছাদে বসে এইরকম গল্প করতাম। আমাদের তো ঐ ঘর আর ছাদ ছাড়া কোথায় যাতি দিত না।

গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুমের রেশ নামে। সবাই নিজ নিজ ঘরের দিকে ছোটে। চাচীর কাঁধে হেলান দিয়ে গল্প শুনতে শুনতে খোকার চোখেও ঘুম নামছিল। সামনের দালান বাড়ীটাও দেখছিল! ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন বাড়ীটা। বাড়ীর ভেতরের ঘরগুলোয় কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার জমে থাকে। আর কী যেন এক গন্ধ জড়ানো থাকে। খোকা একা একা অনেক সময় ঘুরে ঘুরে দেখেছে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে চারপাশ তাকিয়ে ভেবেছে।

ঘরে গিয়ে খোকা মায়ের কোলে মুখ লুকোয়।

ঃ আজ ভাত খাব না মা!

ঃ তো দুধ-কলা খাও বাপ।।

মা দুধ গরম করার জন্য জয়নালকে বলেন। কলাও আনতে বলেন। বিছানায় ছোট ভাইটা ঘুমুচ্ছে। কেমন ফুটফুটে চাঁদের আলোর মতো ওর গায়ের রং। কী সুন্দর করে হাসে। বাবা ওর নাম রেখেছেন নাসের। তার পাশে হেলেন ঘুমুচ্ছে। মাথার একরাশ কালো চুল ছড়ানো। ঘুমানোর জন্য ওর মুখটায় একটা শান্ত প্রশান্তি যেন জড়িয়ে আছে।

পাঁচ

জ্বরে চোখ লাল হয়ে আছে খোকার। মা পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ভিজিয়ে কপালে রেখে জ্বর কমানোর চেষ্টা করছেন। বন্যায় ভেসে গেছে চারদিক। কাল রাত থেকে আবার বৃষ্টি নেমেছে। খোকা কী কারও কথা শোনে? ডিঙ্গি নৌকায় সঙ্গীদের নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিল। নৌকা উল্টে সবাই পানিতে পড়ে হাবুডুবু। ভিজে একেবারে জবুথবু। ভাগ্যিস আক্কাস তাদের সঙ্গে ছিল। নৌকা আবার সোজা করে সবাইকে টেনে টেনে তুলে ফেলে। না হলে কে কোথায় ভেসে চলে যেতো কে জানে!

বন্যার পানি তো খেয়েছে। সেই সঙ্গে ঠান্ডাটা ধরেছে। মা তেল গরম করে বুকে পিঠে মালিস করে দেন। গরম দুধ খাওয়ান। কিন্তু জ্বর ঠিকই এলো রাতে। হাঁচি উঠলে থামে না। নাক দিয়ে সর্দি পড়ছেই। টেনেটুনেও থামানো যাচ্ছে না। সারারাত মাথা ব্যথায় উহ্ আহ্ করেছে। ঘুমুতে পারেনি এক মূহুর্তও। ভোরের দিকে ঘুম এসে খোকার দুচোখে যেন কাজল পড়িয়ে দিয়েছে। সেই ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। চোখ মেলতেই দেখে মা কপালে পানি পট্টি দিচ্ছে। মেজ বুজি তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

মা জিজ্ঞেস করে, "কেমন লাগছে বাবা? ক্ষুধা লাগছে তোমার?" খোকা মায়ের কোলে মাথা গুজে দেয়। কোন কথা বলার শক্তি যেন নাই। মা তার মাথাটা ধরে বালিশে রেখে কপালে চুমু খান। মাথা ভর্তি কালো চুলে হাত বুলিয়ে দেন।

বলেন, 'শুয়ে থাকো মানিক আমার, আমি তোমার জন্য জাউ ভাত রাধছি, নিয়া আসি। মুরগীর সালুন দিয়া খাইবা।' মায়ের সঙ্গে আক্কাস গেলো। ছোট ফুফু তার মাথার কাছে বসেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

তারা এসে খোকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ও মিয়া ভাই, তুমি জলদি ভালা হইয়া ওঠো।' খোকা হাসে। জিজ্ঞেস করে ' কেন রে? এবার কোথায় গিয়ে নৌকা ওল্টাবি?'

তারা বলে, 'আর তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিবে না মামী। আর ঘুরবা কই? বন্যার পানি তো নামে নি মিয়াভাই। স্কুল মাঠ ছাড়িয়ে ক্লাশে ঢুকে পড়েছে। আর কদিন যাক না, এই ঘরের ভেতরে পানি ঢুকে যাবে।'

খোকা তার কথা শুনে বলে, 'তাহলে তো কালিদাস, আবু, মান্নান সবার বাড়িতে পানি ঢুকে পড়েছে। ওরা তো নীচু জায়গায় থাকে। নিশ্চয় খুব খারাপ অবস্থায় আছে।'

তারা বলে, ' হ কষ্ট তো সবারই হবে।'

মা এক বাটি জাউ ভাত ও মুরগীর পাতলা ঝোল নিয়ে এসে বসেন। ফুফু তাকে তুলে বসিয়ে দেয়। মেজ বুজী তার গায়ে কাঁথাটা ভালো করে জড়িয়ে দেয়।

মা চামচে করে তুলে তাকে খাইয়ে দেন। এক চামচ মুখে নিতেই খোকার মুখ যেন তেতো হয়ে যায়। সে বলে 'ও মা লেবু নাই লেবু মাখায়া দাও।' মা বুজীকে লেবু আনতে পাঠায়। খোকার মুখে মুরগীর গোস্ত তুলে দেন। খোকা আবার বলে, 'ও মা একটা ডিম ভাজা খামু?' মা হাসেন। আক্কাসকে বলেন, 'যা তোর বুজীরে ক একটা ডিম ভাইজা দিবে।'

লেবু টিপে রস মাখিয়ে মা আবার তাকে খাইয়ে দেন। খুব ক্ষিধা পেয়েছিল বলে খোকা খেতে লাগলো। ডিমভাজা এলে মা খাইয়ে দেন। খোকা জিজ্ঞেস করে 'তোমরা সবাই ভাত খাইছ মা?'

বড় বুজি বলে, 'তোমাকে নিয়েই তো সবাই ব্যস্ত। তুমি যে পানিতে পড়ে কাহিল হয়ে এলে– মা তো তোমার কাছেই বসা। আমরা খাইছি। মা কিন্তু খায়নি।'

তাঁরাও বলে ওঠে, 'সত্য মিয়া ভাই, মামী কিন্তু কিছু খায়নি। খালি বসে বসে কাঁদছে।'

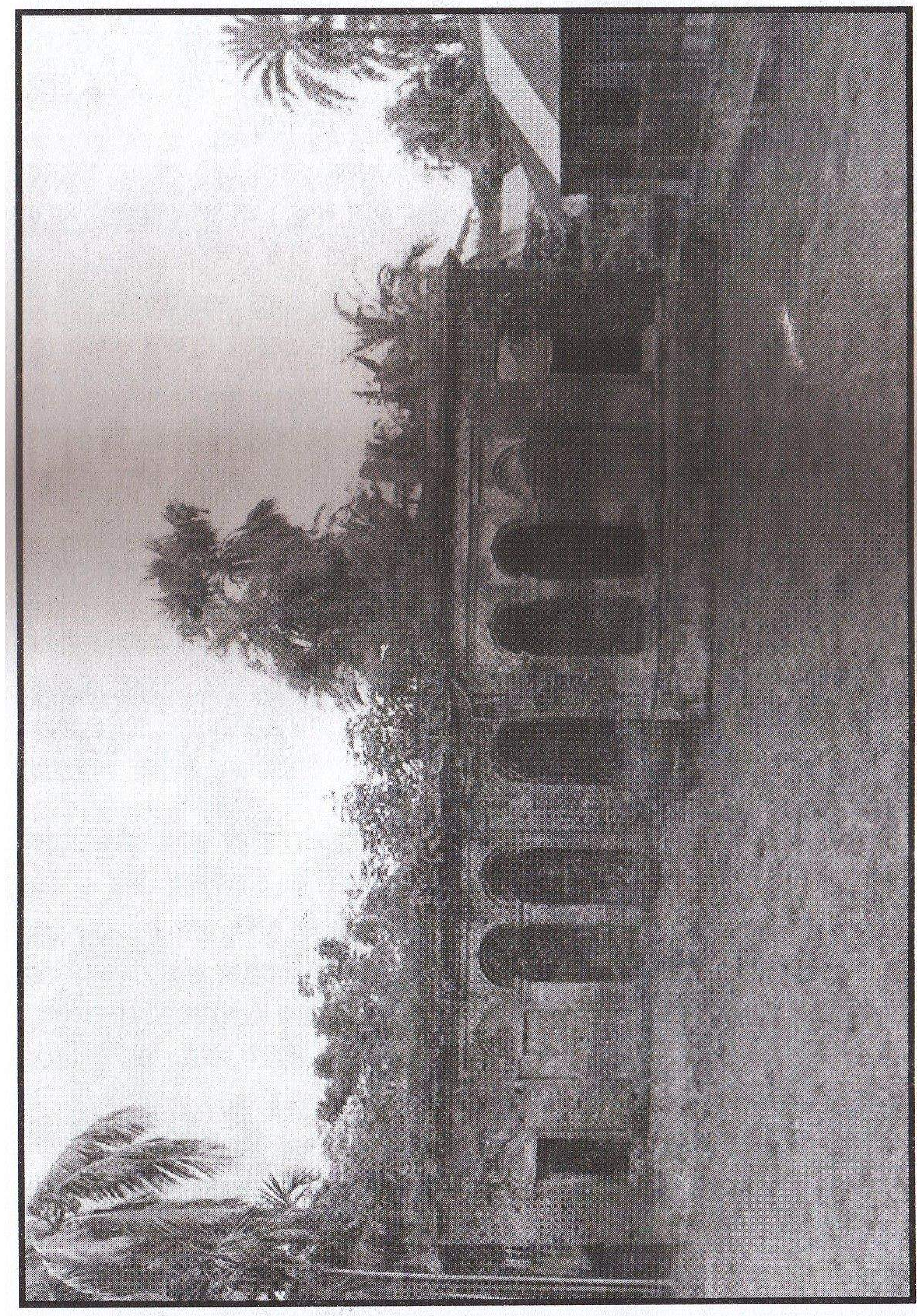

প্রাচীন বাড়ির দালান বাড়ি। পূর্বপুরুষের ভিটে আজ ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করছে ছবি : পাভেল রহমান

খোকা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে 'সত্যই মা, তুমি কিছুই খাওনি কাল থেকে?'

মা তার মুখে শেষ খাবারটুকু তুলে দিয়ে বলেন, 'তুমি ওগো কথা শোন ক্যান বাজান? এখন খাব। তুমি তো ভালো হইয়া উঠছ বাপ আমার।'

পানি খাইয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে মা তাকে ভালো করে শুইয়ে দেয়। বলেন 'এবার একটু ঘুম যাও – শরীর ভালা হইয়া যাব। আজ শুককুর বার তোমার আব্বা আসবেন?'

আব্বার কথায় খোকার দু'চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে 'আর কতক্ষনে আসবে মা?'

মেজ বুজি বলে, 'তুই এখন ঘুম যা ভাই। আব্বার আসতে রাত হয়ে যাবে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।'

মা সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল। তাঁরা আর হেলেন থাকলো। খোকা তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে না রে? আব্বার খুব কষ্ট হবে আসতে। তোরা দু'জন হ্যারিকেন আর ছাতা নিয়ে দাঁড়ায়ে থাকিস। আমি তো আজ থাকতে পারব না। আব্বার যেন কোনও কষ্ট না হয়।'

তাঁরা বলে 'তুমি চিন্তা করো না মিয়াভাই। বৃষ্টি হয়তো থাইমা যাইতে পারে।'

খোকা বলে, 'নারে তাঁরা। শ্রাবন মাসের শেষ এখন। বিষ্টি এখন সহজে থামে না।'

তাঁরা খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। খোকার হাতটা ধরে বসে থাকে। খোকা জিজ্ঞেস করে, 'মা খুব কাঁদছে না রে?'

তাঁরা বলে, 'কাঁদবো না? তোমার কিছু হলে মামী তো চিক্কার পাইরা কান্দে। কাল বিকাল থেকে তোমার কাছে বইসা আছে। রাতে যখন খুব জ্বর আসলো বালতি করে পানি এনে মাথায় ঢালছে। আইজ জ্বর না কমলে তো কবরেজ চাচা আসতো।' খোকা হাসে। বলে, 'কবরেজ চাচার ওষুধ আমি খাইতে পারি না বলেই তো জ্বর নেমেছে।'

মাথা ব্যাথাটা এখনও যায়নি। পাশ ফিরে খোলা দরোজা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পায়। বৃষ্টির শব্দ অনেক হালকা হয়ে আসছে। লাল জবা ফুল ফুটে আছে। ভেজা সবুজ পাতা দেখতে কত সুন্দর। ভুলুটা বারান্দায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। ওকে কী কেউ খেতে দিয়েছে? খোকার হাতে ছাড়া আর কারুর হাতেই খেতে চায় না। বৃষ্টির জন্য বাইরে ঘুরতেও পারেনি বেচারা। আর সেই বোঁচা বানরটা নিশ্চয় গোলাঘরের কোনায় পড়ে আছে। বৃষ্টিতে সেওতো কোথাও যেতে পারে নাই।

বৃষ্টিটা ভালোই নেমেছে। চারদিক কেমন অন্ধকারের ছায়া। ঘরের পেছনে চলাচলের মাটির রাস্তাটায় বন্যার পানি জমেছে বলেই মানুষ কম। সাইকেলের ঘন্টি নেই। একটা নৌকা গেলো। কাজী বাড়ির বড় নানা যাচ্ছে মনে হলো। বন্যার পানি যখন জমেছে তখন কদিন থাকবে। সেই ভাদ্রর মাঝামাঝিতে নেমে যেতে পারে। এতোদিন স্কুল বন্ধ, মাঠের কাজ নাই, হাট-বাজারও বসবে কোথায়?

দালান বাড়ির কার্নিশে তৈরি কবুতর *ছবি : পাভেল রহমান*

মানুষের যাতায়তে কষ্ট হবে। কাজ না থাকলে তো ঘরে বসে থাকতে হবে। খাবে কী? নদী খাল - বিল ভাসিয়ে ঘরে ঘরে পানি ঢুকে পড়ে - এটা তো বড় কষ্টের।

কাঁথাটা আবারও গায়ে টেনেটুনে খোকা ঘুমিয়ে যায়। জ্বরটা একেবারে যায়নি। মাথা শুধু নয় হাত পাও বেশ ব্যথা করছে। পাশের ঘরে নাসের কেঁদেই চলেছে। মা, বুজি কী শুনছে না? তাহলে কোলে নিচ্ছে না কেন। কোথাও বুঝি একটা কাঠঠোকরা ডাকছে ঠুন ঠুন ঠুন শব্দ তুলে। খোকার চোখে ঘুম নেমে এলো।

ছয়

'ও খোকা, খোকা.... বাজান আমার... সোনা আমার.... লক্ষ্মী আমার ওঠো বাবা। ... মানিক আমার ধন আমার, বাজান আমার.... তাকাও বাবা, দেখো তোমার আব্বা আসছেন। চোখ মেলো বাবা ....।'

খোকা পাশ ফিরে ঘুমিয়েই থাকে। বড় ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরেছে। আজ শুধু ঘুমিয়েই থাকতে ইচ্ছে করছে তার।

'ও বাপধন ওঠো বাবা। .... তোমার আব্বা আসছেন।..... ওঠো বাবা। .... দ্যাখো তোমার জন্য কি আনছেন। ও খোকা, সোনা আমার .... চাঁদের কণা আমার। বীর বাহাদুর আমার। ... ওঠো বাবাজান আমার। ...' মা ডাকছে। মায়ের কণ্ঠে যেন মধু ঝরে। বুজি মায়ের পিঠে হাত রেখে বলে, 'ও মা খোকা তো ঘুমায়া আছে। থাক আর ডাকে না। ঘুম শেষ হলেই নিজেই উঠবে নে। ঘুমা ভাইডি।'

বুজি তার গায় কাঁথাটা ভালো করে জড়িয়ে দেয়। কপালে হাত বুলিয়ে বলে, 'ও মা, জ্বর তো অনেক নেমেছে মা। এক্কেরে গেলেই খোকার ঘুম ভাঙ্গবে।'

আব্বা বসে বসে দেখছেন খোকাকে। সেই দিনের আলো মোছার আগেই এসেছেন।

বললেন 'আককাসকে পাঠিয়ে তুমি ভালো করেছিলে। এতো বৃষ্টি দেখে ভাবছিলাম এ হপ্তায় আসব না।'

মা বললেন, 'খোকার এমন জ্বর। আবার পানিতে পড়িছে, তাই চিন্তা করে পাঠালাম। জ্বর হলে খোকা আবার বার্লি, বিস্কুট, বেদনা খাইতে চায়। ঘরে তো কিছু নাই। বানের পানিতে বাজারও বসে না কদিন।'

বাবা বললেন, 'আর খোকাকে এখানে রাখব না। আমার কাছে গোপালগঞ্জ নিয়া রাখুম। সেখানে স্কুলে ভর্তি করায়ে দেব। গ্রামে থাকলে ও নিজের স্বাধীন মতো চলে।'

এই বাড়িতে খোকার জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালে। তখন ছিল ইটের তৈরি ঘর-মেঝে এবং টিনের চৌচালা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী বাড়িটি পুড়িয়ে দিলে পরে বাড়িটি আগের কাঠামো অনুযায়ী তোলা হয়

ছবি : পাভেল রহমান

মা চিন্তিত হয়ে বলেন, 'ও কী কথা! ওকে শহরে নিয়ে যাবেন? আমি থাকুম কেমনে খোকারে ছাড়া। ওরে খাওয়াবে কে? আমার রান্না ছাড়া তো ও খাইতেই চায় না। না, না, আপনি ওরে নিয়া যাবেন না।' মা একেবারে কাঁদতে শুরু করে।

বাবা বলেন, 'অভ্যাস করতে হবে খোকারে ছেড়ে থাকতে। খোকা এখন বড় হচ্ছে। ওর লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ওকে তো বড় হতে হবে। অনেক বড় হবে আমার খোকা। তোমার বাপজান ওর জন্মের সময় নাম রেখে বলছিলেন না খোকার জগৎ জোড়া নাম হবে।'

মা তবুও কাঁদতে থাকে, 'খোকাকে ছেড়ে আমি থাকুম না।'

বুজি মাকে সান্তনা দেয়। বলে, 'কাঁদো কেন মা? শহর তো কাছেই। বাবার সঙ্গে প্রায় হপ্তায় আসবে নে।'

বাবা বললেন, 'বেশ তো তোমরা সবাই চলো।'

মা বলে ওঠেন, 'ও মা তাই হয় নাকি। ঘর খালি থুয়ে সবাই যামু কেমনে? ঘরে সাঁঝবেলা বাতি দেবে কে? ফকির আসলে ভিক্ষা না নিয়া চলে যাবে। আমি বাড়ি ছেড়ে যামু না।'

বাবা বললেন, 'তুমি জেদ করে কথা বললে তো হবে না। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই ওকে নিয়ে যেতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে ও পৃথিবীটা চিনবে কি করে? মানুষকে জানবে কী ভাবে।'

বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। রাত নেমেছে গভীর অন্ধকার নিয়ে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

খোকার ঘুম ভাঙ্গে। দু'হাত দুপাশে ছড়িয়ে হাই তোলে। জ্বর হালকা থাকলেও মাথা ব্যথাটা আছেই।

মাকে কাছে না দেখে ডাকে 'ও মা তুমি কই?' মা পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে। বলে, 'কী হয়েছে বাপধন। ক্ষিধা লাগছে খুব, না?' খোকার কপালে চুমু খায়। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় আব্বাকে হঠাৎ দেখে খোকা খুব খুশি হয়।

উঠে বসে বলে, 'আব্বা কখন আসলেন'। আব্বা কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন। মা দু'জনকে রেখে বেরিয়ে যায় খোকার জন্য খাবার আনতে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে খোকা।

'আব্বা আপনি কখন আসলেন। আমার জ্বরের জন্য আজ ঘাটে যেতে পারি নাই। আপনার কষ্ট হয় নাই তো।'

আব্বা খোকাকে আদর করতে করতে বলেন, 'আমি সব শুনেছি। তুমি পানিতে পড়ে গিয়েছিলে। জ্বরে কাহিল হয়ে গেছ একেবারে।'

মা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। দুধভাত, চাঁপা কলা দিয়ে মাখানো। মা তাকে খাইয়ে দিলো। আব্বা বাইরে বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। আব্বার কথা শুনেই খোকা বুঝে গেছে তিনি খুব চিন্তিত। আব্বা কখনও তার ওপর রাগ করতে

পারেন না। বকা ঝকাও দিতে পারেন না। তবে কোন আদেশ নির্দেশ দিলে খোকা চুপচাপ শুনে যায়। কোন উত্তর দেয় না। মায়ের কোলের কাছে বসে খোকা দুধভাত খায়। মা কত কথা বলে। সে কোন উত্তর দেয় না।

রাতে আব্বা তার কাছে শুয়ে থাকলেন। কত উপদেশ দিলেন। শহরের গল্প শোনালেন। সাহেব পুলিশরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও গোলমাল হলে চাবুক দিয়ে মারে। তাদের বাড়ির পেছনে একটা বড় দিঘি আছে যেখানে সারাবছর লাল-সাদা শাপলা ফুল ফোটে। দিঘির মাছ খুব মিষ্টি।

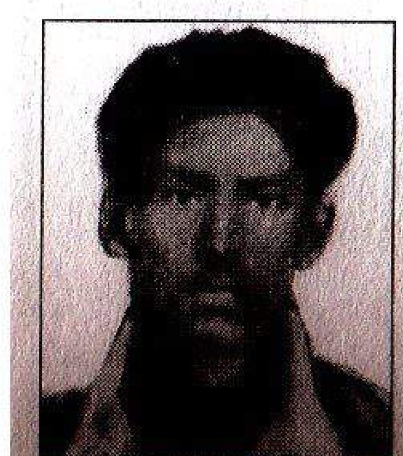

সাত

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই খোকা দেখে আব্বা উঠে গেছেন। সে কাঁথা সরিয়ে উঠে বসে। তারপর পাশের ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় নাসের ঘুমুচ্ছে। তার পাশে ছোট বোন হেলেন ঘুমিয়ে আছে।

খোকা ঘর ছেড়ে বারান্দায় আসে। বৃষ্টি নেই। রোদদুরও নেই। সূর্য ওঠেনি। একদল চড়ুই বরুই গাছটায় খুব হৈ চৈ করছে। উঠোনে বন্যার পানি ঢুকেছে। তার ওপর বাঁশ বসিয়ে পাকঘর ও পায়খানায় যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খোকা মাকে ডাকে। পাকঘর থেকে মেজ বুজি আগে বের হয়ে আসে।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মা কীসব গোছগাছ করতে থাকে। খোকা দেখে তার কাপড় চোপরও গোছান হচ্ছে। আব্বা বললেন, 'খোকা তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

খোকা অবাক হয়। বাবার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে 'আমি, আমি কেন যাবো?'

বাবা বলেন, 'এখন থেকে তুমি আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে।'

খোকা জিজ্ঞেস করে 'আর মা। মা যাবে না? আমি মায়ের কাছে থাকবো আব্বা।'

বাবা বলেন, 'আর কোনও কথা নয় খোকা। তুমি আমার সঙ্গে কাল যাচ্ছ।'

খোকা মা'কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে, 'তোমাকে রেখে আমি যাবো না মা। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।' মা কোনও উত্তর দেন না। কিন্তু তার চোখ দু'টোও জলে ভেসে যাচ্ছে। সে রাতে আব্বা তাকে অনেক বোঝালেন। বললেন, 'লেখাপড়ার জন্য কত ছেলে শহরে যায়। কলকাতায় যায়। তুমিও একদিন বড় হয়ে কলকাতায় পড়তে যাবে। তোমাকে তো অনেক বড় হতে হবে বাবা।'

খোকা মন খারাপ করা একটা কষ্ট পায়। এই টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, মা ও অন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভুলু, গাছ পালা, উঠোনের বরই গাছ, দিঘির সেই মাছরাঙ্গা পাখিটা, স্কুলের খেলার মাঠ, পাটগাতি নদীর ঘাটের নৌকাগুলো, বোঁচা বানরটা, খাল আর বাইগার নদী সব ছেড়ে যেতে হবে। সেই অচেনা - অজানা শহরে মাঠ-ঘাট - গাছ পালা - মানুষগুলো কেমন হবে? তারাও কি তাকে ভালোবাসবে!

এই টুঙ্গিপাড়ার বাতাস সে বুক ভরে নিয়েছে। এখানকার মানুষ তাকে কত ভালোবাসে। সব ছেড়ে যেতে হবে। খোকা রাতে বাবার কাছে শোয়। বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে না শুলে তার তো ঘুমই আসে না। ঘুমুনোর আগে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলে খোকা, এই টুঙ্গিপাড়া আমার জননী জন্মভূমি। শহরে গিয়ে লেখাপড়া করলেও আমি তার কাছে বার বার ফিরে আসবো। এই টুঙ্গিপাড়ার মানুষ আমার আত্মীয়। আমি তাদের দুঃখ কষ্ট অভাব মুছে দেবো। আমি সারাজীবন বাঙালি হয়ে থাকবো। আমি এই টুঙ্গিপাড়ার মাটির গভীরে একদিন মিশে যাব। পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না।

পরদিন সকালে বাবার বজরা নৌকাটা ঠিক ঠাক করা হলো। মা খাবার রান্না করে দিলেন পথে খাবার জন্য। বাবা তাড়া দিয়ে নৌকায় উঠতে গেলেন। মা'কে জড়িয়ে ধরে খোকা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

বলে "মাগো, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাই নি। কোথাও থাকিনি। বলো কেমন করে, থাকবো মা।"

ছোট ফুফু, মেজ বুজি সবাই তাকে সান্তনা দিতে থাকে। "কাইন্দো না। মাকে দেখতেই আসবা। গোপালগঞ্জে তোমার আব্বার সঙ্গে থাকবা। কোন চিন্তা কইরো না।" আক্কাস কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে ঘাটে বজরায় তুলতে। আককাসও সঙ্গে যাবে। ভুলু আর বোঁচা বানরটাও চলেছে সবার সঙ্গে। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "তোমরা ভালো হয়ে থেকো। হেলেন তোমাদের দেখাশোনা করবে। তোমাদের খাওয়াবে। একবারে মন খারাপ করবে না। আমি ঠিক ছুটির সময় চলে আসবো। এ্যাই হেলেন তোর দায়িত্বে ওরা থকবে। কোন চিন্তা করবি না। আমি লেখাপড়া করে যখন বড় হবো তখন তোর সব পাওনা শোধ করে দেবো।"

খোকা চোখ মুছতে মুছতে ফিরে ফিরে তাকায়। মা, ছোট ফুপু, মেজ বুজি, তাঁরা বড় উঠোন পর্যন্ত এলো। মায়ের কোলে নাসের। চোখ মেলে যেন বড়ভাইকে দেখছে। খোকা তাকে আদর করে চুমু খায়। মা খোকাকে জড়িয়ে ধরেন। তার কপালে চুমু খেয়ে আদরে ভরিয়ে দিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন মমতায়। মেজ বুজি তার গায় হাত বুলিয়ে দিলো। তাঁরাও কাঁদছিল আর সব সঙ্গীদের সঙ্গে। পাশের বাড়ির চাচারা চাচীরা সবাই এলেন। ওরা ঘাট পর্যন্ত এলো বন্যার পানিতে হেটে হেটে। ঘাটে এসে সোজা বজরায় উঠে খোকা ভেতরে গিয়ে বসে। আর পিছু

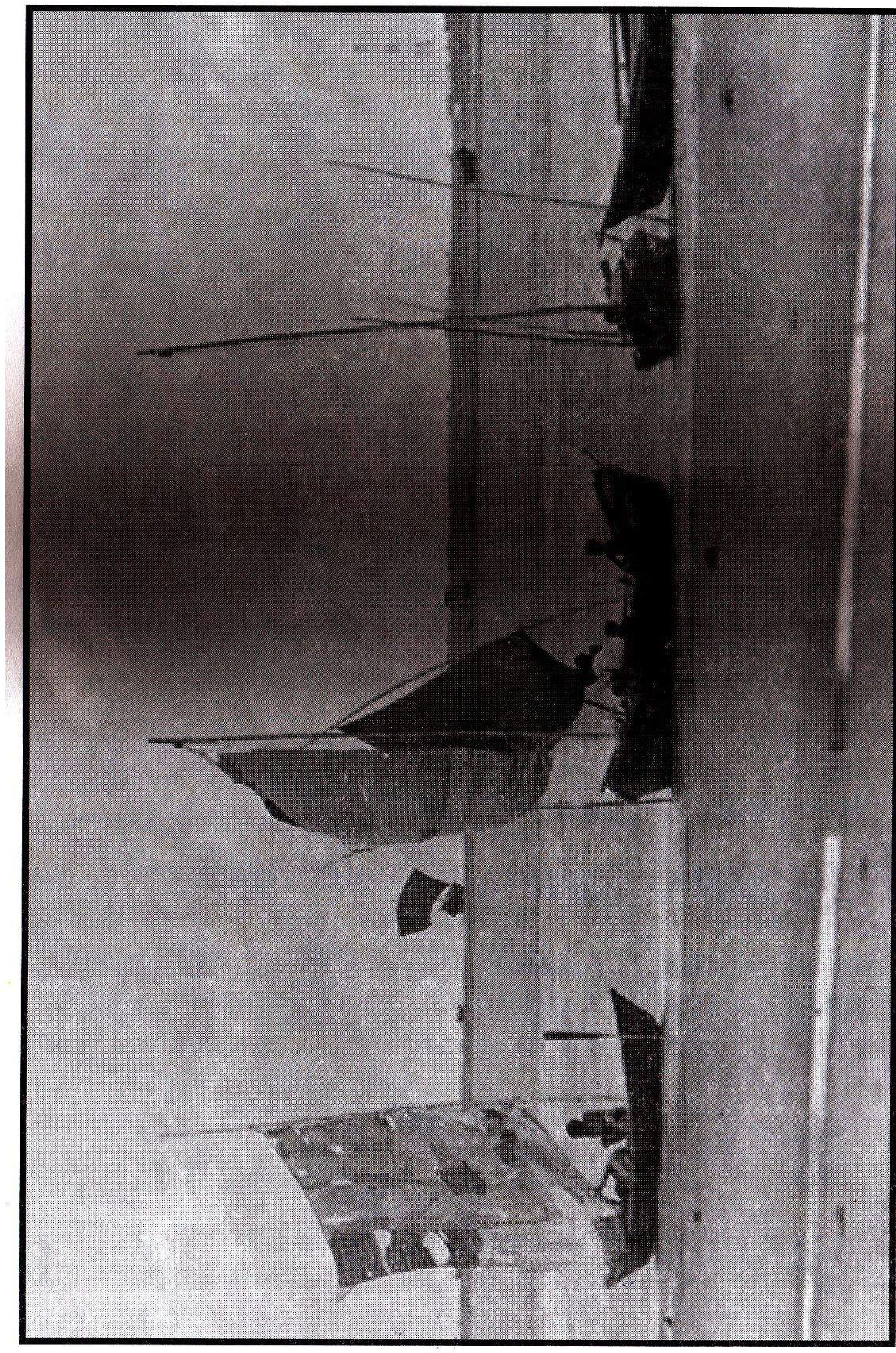

মধুমতি নদীতে প্রতিদিন অসংখ্য পাল তোলা নৌকা ভেসে যায় দূরে অনেক দূরে। এই নদীর বাতাস যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো
ছবি : পাভেল রহমান

ফিরে দেখতে ইচ্ছে হলো না। বাবা শুয়ে আছেন। বেশ সুন্দর বজরা নৌকা। মাঝি একজন, তবে আক্কাসও আছে। ছেড়ে দিতেই তর তর করে ছুটে চললো।

মধ্য আকাশে তখন সূর্য। তার আলোয় চারদিক আলোকিত। গাছপালা পাতার ফাক দিয়ে সেই আলোর চমক ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ষার দিনে সূর্য উঠলে চারদিক কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে। খোকা বসে বসে এইসব দৃশ্য দেখছিল। বাবা তাকে কাছে টেনে কোলে বসান। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন। গালের সঙ্গে গাল মিলিয়ে বলেন, 'আমার খোকা বড় লক্ষীছেলে। খোকার মন খুব ভালো। লেখাপড়া করে খোকা একদিন বড় হবে। দেশের জন্য কাজ করবে। মানুষের সেবা করবে।'

খোকা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে ' তারপর একদিন টুঙ্গিপাড়া ফিরে আসবো। আর কোথাও যাবো না। কোথাও না।'

আট

গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংক পাড়ার সরু রাস্তার দু'পাশে দু'টো জায়গায় বাড়ী। বড় পুকুরের ধারে আত্মীয়-স্বজনরা থাকে। ডানপাশে নারকেল গাছ ঘেরা বাড়ীটায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মা এসে থাকবেন বলে বাবা নতুন টিন কিনে এনে সুন্দর করে চৌ-চালা ঘর বানালেন। ঘরের আঙিনা জুড়ে পেয়ারা বরই, লেবু আর একটা শিউলি ও জুই ফুলের গাছ থাকলেও-খোকার মন বসে না। টুঙ্গিপাড়ার ঘর, বাতাস ছাওয়া গাছপালা, সাঁকোপারের মাঠ, খাল পারে ঝাঁপঝাঁপি করে মাছ ধরা, ধান ক্ষেতের ফাঁকে ধুলোভরা মেঠো পথ, নদীর পানিতে রোদ আর জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি, পাটগাতির বাজার, বন্ধুদের ভালোবাসার পিছুটান তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ফেলে আসা সব দিনগুলো বুকের কোথায় যেন মমতার স্মৃতি হয়ে গেল সব।

গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে খোকা চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। বাড়ী থেকে বের হয়ে বেশ কিছুটা পায়ে হাটা পথ। তারপর বড় রাস্তা ধরে গিয়ে নদীর ধারে স্কুল। প্রথম দিনেই বেশ ক'জন ছাত্র খোকার বন্ধু হয়ে গেল। খোকার ভালোবাসা তাদের এমনভাবে গেঁথে রাখতো যে নড়তে চাইতো না। খোকার ভক্ত সংখ্যা বেড়ে চললো। মাসখানেক বাদে বাবা টুঙ্গিপাড়া থেকে তাঁরাকেও নিয়ে এলেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তাঁরা এখন থেকে খোকার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে রইলো। মা

মাঝে মাঝে এসে থেকে যায়। মা এলে খোকার খুব ভালোলাগে। গরমের ছুটির সময় সবাই আবার টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে থাকে।

এই স্কুলে রীতিমত লেখাপড়া করতে হয়। শ্লেট নয়, সাদা কাগজের খাতায় রুল টেনে কাঠ পেন্সিল দিয়ে লিখতে হয়। রোজ রোজ পড়া ধরেন মাষ্টার মশাইরা। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পড়তে বসতে হয়, পড়া মুখস্ত করতে হয়। হাতের লেখা লিখে আর অংক কষেও আনতে হয় স্কুলে। খোকা অবশ্য ব্রতচারী করতে যায়। সেখানে কত কী শেখানো হয়।

বড় বুজি শ্বশুরবাড়ীতে থাকে এখন। সেবার যাবার সময় মাকে জড়িয়ে ধরে কী কাঁদাটাই না কাঁদলো। বাবার কিনে আনা একটা নতুন লাল শাড়ী পরেছিল বুজি সেদিন। মায়ের মুখের মতন কেমন এক মমতায় ভরা ছিল বুজির মাখখানা। দূর থেকে খোকা দেখছিল, কাছে একবারও যায়নি। বুজির জন্য তারও বুকের ভেতরে একটা কষ্ট জড়ানো কান্না জমেছিল বৈকি! মেজ বুজির বিয়েও হয়ে গেল। তারা কলকাতা শহরে থাকে। বাড়ি এল বুজি কত গল্প করে। তার জন্য একবার শনপাপড়ি এনেছিল। খেতে খুব মজা।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় হঠাৎ খোকার প্রচন্ড মাথা ব্যথা হলো। চোখও জ্বালা করে। বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তারা দুচোখ ভালো করে দেখে বললেন, 'বেরিবেরি রোগ হয়েছে। কলকাতা নিয়ে যান। দেরী করবেন না।"

বাবা আর দেরী করলেন না। গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে বড় স্টীমারে চড়ে কলকাতায় নিয়ে গেলেন খোকাকে। কলকাতা দেখে খোকা তো ভারী অবাক। কত বড় বড় দালান। বড় বড় রাস্তা। আর কত মানুষ। কতরকম গাড়ি। কলকাতায় মেজ বুজির বাসায় থাকা হলো। বড় বড় ডাক্তাররা দেখে চিকিৎসা করলেন। লেখাপড়াও বন্ধ রাখতে হলো।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলাটা ভারী অসহ্য। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে থাকতে হয়। কেমন ক্লান্তি আর থেকে থেকে হাই ওঠে। গরমের জন্য স্কুল ছুটি। কাল আতিয়ার এসেছে গোপালগঞ্জ থেকে। বাবা মাদারীপুর কোর্টে বদলী হয়েছেন। দু'দিন পরেই মাদারী-পুর চলে যাবেন। পরের বার সবাইকে নিয়ে যাবেন মাদারীপুর।

খবরটা শোনার পর থেকে খোকার মনেও একটা অনুভূতি জেগেছে। মাদারীপুর যাওয়া কী সহজ কথা। মাদরীপুর অনেক দূরের পথ। তাই প্রতি সপ্তাহে তাঁর পক্ষে বাড়ী আসা সম্ভব হবে না। অবশ্য আগেই বলেছেন, তিনি কিছুদিন থেকে সব গুছিয়ে দিয়ে চলে আসবেন।

লঞ্চ না হয় বড় নৌকায় যেতে হবে। খোকা বাবাকে বলেছে, যেন বড় নৌকায় যাবার ব্যবস্থা করেন। লঞ্চে গেলে তো খুব তাড়াতাড়ি মাদারীপুর পৌঁছে যাবে। ভালো করে সবকিছু দেখা যাবে না।

আর নৌকায় যাবার মজাই অন্যরকম। চারদিকের ফসলের মাঠ ঘাট গাছপালা ঝোপ-ঝাড় আর ছবির মতন দাঁড়িয়ে থাকা সব গ্রাম দেখতে দেখতে দু' চোখ জুড়িয়ে যায়।

খোকা বলল ঃ আমরা সবাই যাব, বাবা।

ঃ হ্যাঁ সবাই তো যাবে।

ঃ নাসের আর লিলি যাবে? ওরাও ছোট্ট বাবা, ওদের যদি কষ্ট হয়।

ঃ না, কষ্ট হবে কেন? তোমার মা যাবেন তো! মায়ের কাছে থাকবে।

ঃ আমরা বড় নৌকায় যাব, না বাবা?

ঃ হ্যাঁ বড় নৌকাতেই যাব। বাবা খোকার উৎসাহভরা উজ্জ্বল মুখ দেখে হাসতে হাসতে বলেন। খোকা সে রাতের অনেকটা সময় অনেক কল্পনা আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটাল। নৌকায় চড়ে এই প্রথম দূরে কোথাও যাওয়া। খোকার কাছে একটা বিরাট ঘটনা রোমাঞ্চকর বলে মনে হলো।

পরের সপ্তাহে বাবার সঙ্গে মা, খোকা, হেলেন, নাসের আর মায়ের কোলে চড়ে ছোট্ট লিলি মাদারীপুর চলল। বড় নৌকার ভেতরের ঘরে জানালা খুলে বসতে খোকার আনন্দের যেন কোন সীমা নেই। মধুমতীর মাঝখানে নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। বাবার হাত ধরে খোকা মাঝিদের হাল বাওয়া দেখে। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। দূরে দূরে নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতন সাজানো গ্রাম। আর কত রংয়ের পাল তুলে চলেছে নৌকা। কয়েকটা নৌকা ভর্তি গেল পাটের আঁশ। বাবা বললেন, ওগুলো কলকাতা যাবে। তারপর বোম্বাইতে বড় জাহাজে করে বিলাতে যাবে-সাহেবদের দেশে। নদীর বাতাসে ক্ষিদে লাগে বেশ। মা সবাইকে নারকেলের নাড়ু, মুড়ি খেতে দিলেন। মাদারীপুর পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে আসবে। খোকা কিছু মুড়ি ছড়িয়ে দেয় পানিতে। মাছ দেখার আশায় গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বাবা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন

ঃ কি খোকা, কি দেখছ পানিতে?

ঃ মাছ কেমন করে খায় দেখতাম। কিন্তু মাছ কই বাবা?

ঃ নদীর মাছ কি আর সব সময় দেখা যায় বাবা। গভীর পানিতে চলে যায়।

খোকা আর কোন কথা বলে না। দূরের গ্রাম আর সবুজ গাছপালার দিকে দু'চোখের দৃষ্টি বোলায়। অনেকগুলো নৌকা নদীতে। একটা ইস্টিমার কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়। নৌকাগুলোর নানান রঙের পাল। খোকা চোখ তুলে দেখে। তাদেরটা ঘন লাল রংয়ের। শেষ বেলার সূর্যের আলোয় মনে হচ্ছে যেন আগুন ঝরাচ্ছে। বাবার পাশে জানালা ঘেষে বসে থাকতে থাকতে খোকা একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

নয়

মাদারীপুর শহরটা বেশ ছোট্ট। খোকা হাইস্কুলে ভর্তি হলো। এখন সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু লেখাপড়ায় খোকার মন সাড়া দিল না। চোখের সমস্যা তো আছেই। গোপালগঞ্জের স্কুলের মতো বন্ধুরা এখানে নেই। স্কুলের সামনেরও খেলার মাঠও নেই। শহরটাই যেন কেমন, ঘরের উপর ঘর। টুঙ্গীপাড়ার মতো সেই শ্যামল গাছপালা নেই। নদীর ধার ঘেঁষে ইচ্ছেমত হাঁটতেও পারা যায় না। নদী বেশ দূরে। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে তবেই নদী। টুঙ্গীপাড়ায় ঘরে বসেই নদীর ভেজা বাতাসের পরশ পাওয়া যায়। সাঁকোর ধার সব ছেলেরা দল বেঁধে নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি তো করেই আবার ছোট্ট মাছ ধরার মজাও সেখানে কম নয়। রাত নামলে চারদিক কেমন নির্জন হয়ে আসে। শুধু শোনা যায় ঝিঁঝিঁর একটানা ডাক। শেয়ালের ডাক তো আছেই। আর শোনা যায় নারকেল সুপারী হিজল বকুল তমাল গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দ।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বাবা সবাইকে টুঙ্গীপাড়ায় নিয়ে এলেন। অবশ্য মা খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ফেরার জন্য। ঘর-দুয়ার সব বন্ধ ছিল। আতিয়ারকে নিয়ে সব খুলে ঝাড়ামোছা শুরু করে দিলেন। আর সেই একটানা বকবক, "ঘরে না থাকলে আমার সংসার কে দেখবেনে।"

মেজ চাচী বাটি ভরে সর ভাসা দুধ, আম ও মুড়ি মাখিয়ে খেতে দিলেন। খোকাকে বাড়ীর সব ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরলো। কতদিন পর তারা মিয়াভাইকে দেখছে। কতসব মজার মজার ঘটনা আর কথা রয়েছে মিয়াভাইকে শোনানোর। সবাইকে নিয়ে খোকা সাঁকো পাড়ে চলে। আজ মাঠে গিয়ে গল্প হবে। ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করে খেলা হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বড় পুকুরপাড়ে আমগাছের মগডালে এখনও বেশ কিছু পাকা আম রয়েছে। সব পেড়ে খাওয়া যাবে।

ছুটি শেষ হলে বাবার সঙ্গে মাদারীপুর চলে আসে খোকা।

কিছুদিন পর খোকার চোখের সমস্যা আবার দেখা গেল। ডাক্তাররা বললেন, " এবার কলকাতায় নিয়ে বড় ডাক্তার দেখান।'

আবার কলকাতায় যেতে হল। বাবা তাকে নামকরা চোখের ডাক্তার টি আহমদের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি দু'চোখ ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, 'চোখে গ্লুকোমা রোগ হয়েছে। শীঘ্রি দু'চোখের অপারেশন করতে হবে, নাহলে আর দেখতে পাবে না।' তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করালেন। তারপর

দু'চোখেরই অপারেশন হলো। প্রথমে খোকা খুব ভয় পেয়েছিল। বাবা তাকে সাহস দিলেন। অপারেশনের পর এক সপ্তাহ চোখ বন্ধ। খোকার খুব কষ্ট হলো। এভাবে কী ঘরে শুয়ে বসে থাকতে ভালোলাগে। চোখ খোলার পর চশমা পরার ব্যবস্থা হলো। চোখের সেই জ্বালা করা ব্যথাটাও আর নেই। কিন্তু ডাক্তার সাহেব বাবাকে বলে দিলেন, লেখাপড়া বন্ধ থাকবে। চোখের উপর কোন চাপ রাখা যাবে না।' শুনে খোকার মনটা আরও খারাপ হলো। বাবা খুব চিন্তিত হলেন।

মাদারীপুরে ফিরে আসার পর মা এলেন। খোকার স্কুল যাওয়া, বাইরে খেলাধুলা সব বন্ধ। খোকা ঘরে বসে সময় কাটায়। মায়ের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েও অনেকদিন থাকা হলো। স্কুল যাওয়াও বন্ধ। বাইরে খেলতে যাওয়া বন্ধ। কতক্ষণ আর ঘরে বসে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে। খোকা এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

খোকার জন্য সবারই আদর যত্ন একটু বেশি বেশি। খালারা কে কি করবে, কি খাওয়াবে ভেবেই অস্থির। আমসত্ব, নারকেলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া ও পিঠে থেকে শুরু করে বড় কই মাছ ভাজা, রুইয়ের পেটির ঝোল, সোনা মুগের ডালে রান্না রুইয়ের আস্ত মাথাটা পর্যন্ত খোকার পাতে তুলে দিয়েও তারা তৃপ্তি পায় না। খোকার খুব মজা। সে এখন বড় হচ্ছে। মাথাভর্তি কালো চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা।

সবার দৃষ্টি এখন তার দিকে। মা শুধু বলে, 'খোকা আমার রোগা পাতলা থেকে গেল।'

তিনবছর পর বাবা আবার গোপালগঞ্জ কোর্টে বদলি হলেন। খোকা আবার গোপালগঞ্জ এসে মিশন হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি হলো। দু'বেলা প্রাইভেট পড়ানোর জন্য বাবা কাজী আবদুল হামিদ মাষ্টারকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে দিলেন। ভালো লেখাপড়া জানা লোক, এম, এস, সি পাশ। তবে গান্ধীজীর ভক্ত। সূর্যসেনের শিষ্য হিসেবে সন্ত্রাসী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

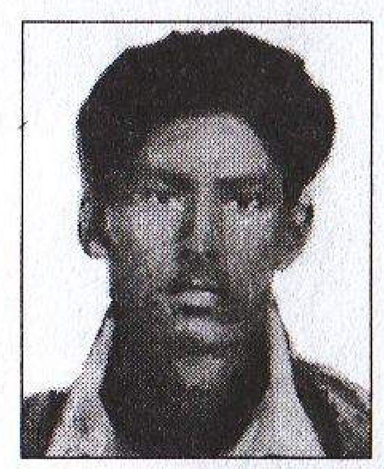

দশ

হামিদ মাষ্টারের পড়ানোর ভঙ্গিটা খোকার খুব পছন্দ হল। বাংলা কবিতা আর গদ্য-গল্প বোঝান, কতকিছু ব্যাখ্যা করেন। তখন তিনি বইয়ের দিকেও তাকান না। অংকও শেখান কত সুন্দরভাবে সংখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে। ভুগোল বইয়ের ভেতর বন্দী পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে তুলে ধরেন তিনি। পড়তে পড়তে মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি মুহুর্তে হাতের মুঠোয় চলে এলো। একটুও জটিল মনে হয় না।

সামনে বসা মহাত্মা গান্ধী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পেছনে দাঁড়ানো শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যরা
ছবি : আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

তবে সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে খোকার ইতিহাসের গল্প শুনতে। একদিন মাষ্টার সাহেব সিরাজউদ্দৌলার গল্প শোনালেন। মুর্শিদাবাদের ছেলে তিনি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব। দেশের স্বাধীনতার কথা ভেবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। দেশের মানুষের স্বার্থকে তিনি বড় করে দেখেছিলেন। তাঁর নিজের লোকরাই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ইংরেজদের পক্ষ নেয়। ফলে পলাশীর আমবাগানে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয় তাতে তিনি পরাজিত হন। ইংরেজরা ধীরে ধীরে এদেশ দখল করে নেয়।

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধের কথা মাষ্টার সাহেব কাগজে এঁকে খোকাকে দেখান। যুদ্ধের কথা শোনান। আর একদিন শোনালেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা। মাত্র সতের বছরের এক সাহসী কিশোর ক্ষুদিরাম ইংরেজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়েছিল। সাহেব মারা যায়। তারপর ধরা পড়ে বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির গল্প বলতে বলতে মাষ্টার সাহেব খানিক আনমনা হয়ে যান। পরক্ষণেই তাকিয়ে দেখেন তার ছাত্রের স্বপ্ন জড়ান দু'টি চোখ বড় বেশি উজ্জল। খোকা বলে,

ঃ মাষ্টার সাহেব, সিরাজউদ্দৌলা, তিতুমীর ও ক্ষুদিরামের সংগ্রাম এসব তো গল্প নয়। এই দেশের মানুষের কথা। সত্যি কথা।

ঃ হ্যাঁ, সব সত্যি কথা। তুমি বড় হও, সব দেখবে শুনবে, নিজে আরও বেশি জানতে পারবে। ইংরেজরা এই দেশটাকে শাসন করে শোষণ করে মানুষকে শুধু দু:খ-কষ্টে জর্জরিত করেছে। দরিদ্র বানিয়ে রেখেছে। এদেশের মানুষ বড় সরল, অত্যন্ত পরিশ্রমী অথচ দু' বেলা পেটভরে ভাত খেতে পারে না। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কত কষ্ট করে জীবন কাটায়।

খোকার মনে পড়ে যায় সেই বাঁশি বাজানা ছেলেটার শুধু পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খাওয়ার কথা। পাটগাতি স্কুলের কোন কোন ছেলের বোতামহীন একটামাত্র ছেঁড়া শার্টের কথা। সাঁকো-পাড়ে গুড় মাছ তরকারীর ঝাপি নিয়ে বসে থাকা শুকনো মুখের মানুষগুলোর কথা। ওরা গ্রামের কৃষক। ওরাই এদেশের মানুষ। ওরা কত কষ্ট করে ফসল ফলায়, মাছ ধরে। অথচ ওদের জীবনের মান কত অনুন্নত।

হামিদ মাষ্টারের সঙ্গে খোকা মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হয়। কখনও নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায়। কখনও থানা পাড়া, পুলিশ লাইন ধরে কোর্টের দিকে এগিয়ে গেলে রাজবন্দীদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে দেখে। কলকাতায় গান্ধিজী আইন অমান্যের ডাক দিলেন। গোপালগঞ্জ শহরে বড় বড় সভা আর মিছিল হল। মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে খোকাও একদিন মিছিল দেখতে গেল। সেপাইরা প্রথমে লাঠি চালাল। কয়েকজনকে ধরেও নিয়ে গেল। সেই প্রথম খোকা দেখল গোরা সেপাইদের।

স্কুলে যতক্ষণ থাকে খোকা-পড়াশুনা, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ আর খেলাধুলা করে কাটায়। ঘরে বেশ শান্ত থাকে। মাষ্টার সাহেবের ঘরই তার বড় আকর্ষণ। কত কাগজ বইপত্র আর ছবি। গান্ধীজীর একটা বড় ছবি, ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে। তার পাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। মাষ্টার সাহেব বলেন,

ঃ বুঝলে খোকা, এই হলো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা লিখে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। খোকা মুগ্ধ

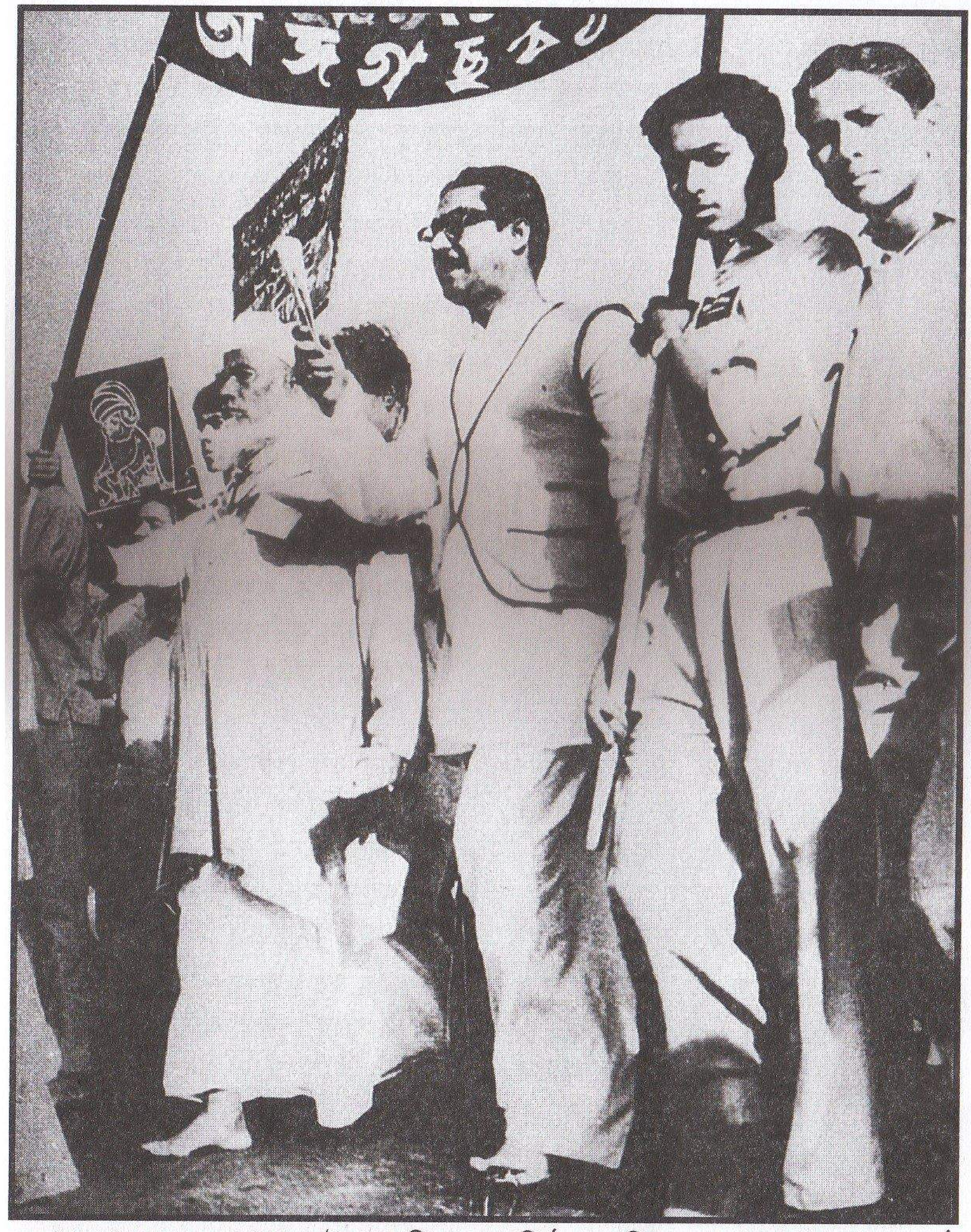

১৯৫২ সালে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে শেখ মুজিব তার নেতৃত্বও দেন। ১৯৫৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরীর মিছিলে শেখ মুজিব ছবি : সংগৃহীত

দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাড়ীতেও মাঝে মাঝে ভালো লাগে না খোকার। নারকেল গাছ ঘেরা বাসাটা ছেড়ে তারা এখন পুকুর পাড়ের বাসাটায় থাকে। পুকুর ধারের শেষ মাথায় একটা আমগাছ একলা দাঁড়িয়ে। তার শাখা প্রশাখা চারদিকে বিস্তার করে যেন দাঁড়িয়ে আছে। খোকার প্রিয় জায়গা এটাই। তার নীচে প্রায়ই বসে থাকে। একা একা বসে থাকার মধ্যেও কেমন যেন একটা ভালোলাগার স্বাদ পাওয়া যায়। অনেক কিছু ভাবা যায়। মাস্টার সাহেবের মুখে শোনা দেশের কথা। মানুষের কথা। খোকা এখন কলকাতা থেকে আসা খবরের কাগজও পড়ে।

তাঁরা এসে পাশে বসে কখনও।

ঃ চল না মিয়াভাই, আজ সাঁতার কাটি।

ঃ হ্যা, চল।

দু'জনে ঘন ছায়ায় ঢাকা পুকুরের টলটলে পানিতে একসঙ্গে ঝাঁপ দেয়।

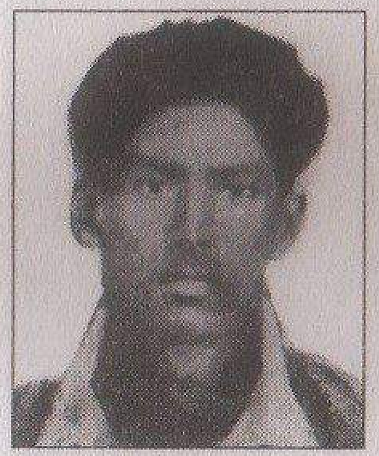

এগারো

মাঘ মাসের শীত এবার বেশ জাকিয়ে নেমেছে। দিনে রাতে কনকনে ঠান্ডা বাতাস হাড় কাঁপাতে শুরু করে।

খোকা এবার নবম শ্রেণীতে উঠেছে। লম্বায় বাড়লে হবে কি, গায়ে গতরে আগের মতই রোগা পাতলা রয়ে গেছে। ঘরে আজকাল লুঙ্গি পরে, চেক লুঙ্গিই ওর পছন্দ। আর দেশি কাপড়ের ফতুয়ার মতন শার্ট গায়ে দেয়। নাহলে পাজামা-পাঞ্জাবী। পাজামা-পাঞ্জাবী পরলে ভালোই মানায়, লম্বা বলেই হয়তো। শীতের দিন এলে মা পাজামা হাফ হাতা গেঞ্জী, ফুলহাতা শার্ট পরিয়ে তার উপর গরম চাদর জড়িয়ে দেয়। স্কুলে যাবার সময় গরম ভাত খেয়ে যায় পেটভরে। এক বাটি দুধও সাধে মা। বাবা সামনে থাকলে কোনকিছু না বলে খেয়ে চলে যায়। না থাকলে তো দুধের বাটি হাতে মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে দে ছুট।

এখন ক্লাশে অনেক পড়া। অনেকক্ষণ ধরে ক্লাশ হয়। কিন্তু মাঠে ছুটোছুটি করে বল খেলা, পেয়ারা গাছে চড়া এসব বন্ধ হয় না। স্কুল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছে সে। ভালো খেলতে পারে এমন ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। তাদের নিয়ে সকাল বিকাল প্রাকটিসও করে। বেশ কয়েক জায়গায় ফুটবল প্রতিযোগিতা করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সামনে অফিসার্স ক্লাবের সঙ্গে খেলা হবে। সে স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন আবার আব্বাও অফিসারস ক্লাবের ক্যাপ্টেন। খোকা তাই বেশ চিন্তায় আছে। তারা তো বাইরে থেকে খেলোয়াড় নিয়ে আসে।

সেদিন ছুটির পর সব বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে বাড়ী ফিরছিল। একেই মাঘ মাসের কনকনে ঠান্ডা বাতাস, তারপর আবার মেঘলা আকাশ। সবাই বেশ কাঁপতে কাঁপতেই বাড়ী ফিরছিল।

খোকা একদিন বড় হলো। তরুণ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দাবি জানালেন। শেখ মুজিব ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় গ্রাম থেকে গ্রামে, সারা দেশ ঘুরে মানুষকে সংগঠিত করে তোলেন ছবি : সংগৃহীত

হঠাৎ চোখে পড়ে বড় রাস্তার মোড় ঘেষে গলির ধারে ধুলোর মধ্যে এক বৃদ্ধ ফকির শীতে কাঁপছে আর কাঁদতে কাঁদতে ভিক্ষা চাইছে। বৃদ্ধের শীর্ণ খালি গায়ের হাড়গুলো বড় স্পষ্ট গোণা যায়। লোকজন কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ দু'একটা পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে। খোকাও বন্ধুদের নিয়ে একবার দাঁড়ায় তারপর গায়ের চাদরটা মূহূর্তে খুলে দ্রুত বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দেয়। সবাই তো অবাক! এরপর সে হন হন করে হেঁটে বাড়ীর দিকে

চলে। পেছন ফিরে একবারও তাকায় না। বৃদ্ধ হতবাক হয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে যায়,

ঃ বড় হও বাবা, আল্লাহ তোমারে বাঁচায়ে রাখুক। তুমি অনেক বড় হও, রাজা হও।

খোকার স্কুল থেকে ঘরে ফেরার সময়টা মায়ের মনে থাকে। কলাগাছের ঝোঁপের পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশের বেড়া ধরে খোকার আসার পথ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। আজ খোকাকে হন হন করে ঢুকতে দেখে মা অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে,

ঃ কিরে বাবা গায়ের চাদরটা কই?

ছোট বোন হেলেন বলে ওঠে।

ঃ ও মা জান না, মিয়া ভাই সেই সুন্দর নতুন নীল শার্ট খানাও সেদিন কাকে দিয়ে এসেছে। খোকা কিছু বলে না। বইখাতা রেখে গামছা লুঙ্গি নিয়ে হাত মুখ ধুতে যায়। মা ভাবে ছেলে নিজের কাপড়-চোপর দিয়ে দেয়, বর্ষার দিনে ছাতা পর্যন্ত দিয়ে দেয়। একটু বাদে তাঁরা এসে ঘরে ঢোকে। সেই মামীকে সব কথা খুলে বলে। সেই বৃদ্ধের দোয়ার কথাগুলোও।

রাতে খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মা একখিলি পান মুখে দেয়। তারপর হ্যারিকেনের বাতিটা ফু দিয়ে নেভানোর আগে আজ একবার উজ্জ্বল করে খোকার মুখটা দেখে। ঘুমন্ত কোমল মুখখানা জুড়ে কত প্রশান্তি। কত রঙিন স্বপ্নের আঁকিবুকি খেলছে যেন।

মা ভাবে, এই ছেলে জন্মেছিলো দেখে শেখ বংশের বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। বড় ধুমধামের সঙ্গে আকিকার আয়োজন হয়েছিলো। খোকার নানা নিজে ওর নাম রেখে তাকে বলেছিলেন,

ঃ বুঝলে মা সায়েরা তোমার খোকার নামটা বড় হলেও ভালো হলো। জগৎজোড়া নাম হবে। সবাই এই নামেই ডাকবে।

মায়ের দু'চোখ ছল ছল করে ওঠে। খোকার কপালে তিনি স্নেহ চুম্বন দেন।

বারো

মাস্টার সাহেবের কথামতো খোকা তার বন্ধুদের নিয়ে একটা 'মুষ্টি ভিক্ষা সমিতি' করেছে। স্কুল ছুটির দিন তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করে। সেই চাল কখনও কখনও গরীব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হয়। আবার কখনও বাজারে বিক্রি করে ছাত্রদের বই খাতা পেন্সিল কিনে দেয়া হয়। যারা বাড়ি বাড়ি জায়গীর থেকে লেখাপড়া করে তাদেরও অনেককে সাহায্য করতে হয়।

১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা ঘোষণা করলেন শেখ মুজিব। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। সেই মামলায় বন্দী মুজিবকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিশেষ আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে ও বাঙালির স্বাধিকারের দাবিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হয়। শেখ মুজিব মুক্তি পান। ছাত্র-জনতা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয় ভালোবাসা ও মমতার উষ্ণতায় ছবি : সংগৃহীত

স্কুল ছাত্র খেলোয়াড় শেখ মুজিব (সামনের সারিতে বসা অবস্থায় বুকে ক্রস চিহ্নিত) ছবি : সংগৃহীত

সেই ছোট্ট খোকা একদিন বাঙালির ইতিহাসে মহামানব হলো। ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলো 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৬ মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করে বিশ্বে তাঁর পতাকা প্রতিষ্ঠিত করে। শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে এসে প্রথমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি হন ছবি : মোজাম্মেল হোসেন

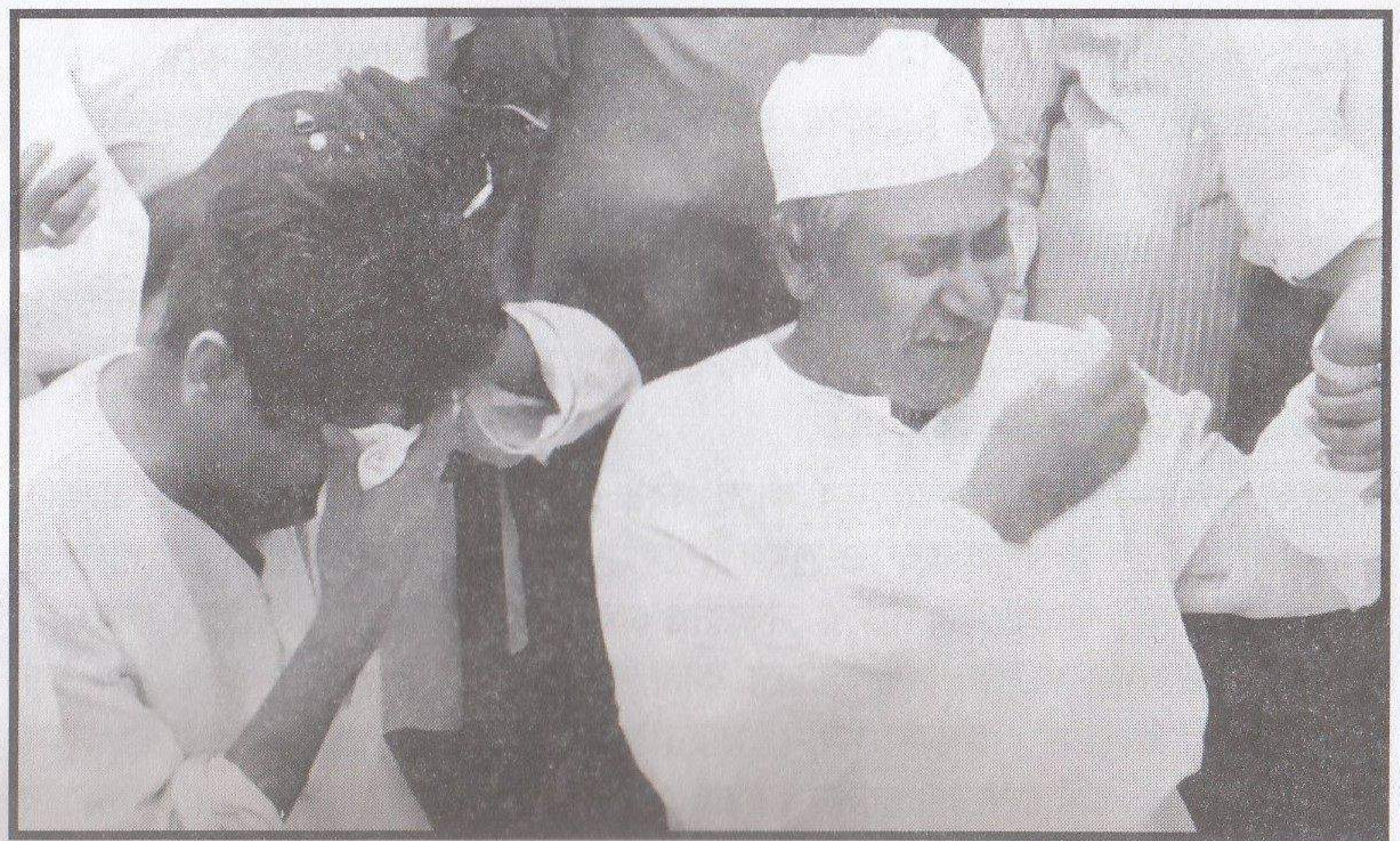

মা মারা গেলেন ৩১ মে, ১৯৭৪ সাল। বাবাও মারা গেলেন ৩০ মার্চ, ১৯৭৫ সালে। বাবার শোকে কাঁদছেন দু'ভাই শেখ মুজিব ও শেখ নাসের। এর সাড়ে চার মাস পর ১৫ আগস্ট নিহত হলেন শেখ মুজিবসহ পুরো পরিবার। ছোট ভাই শেখ নাসেরকেও ঘাতকরা হত্যা করে সেদিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরাই সেদিন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করে বাঙালির স্বাধীন সত্তা ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার সাহসী নেতা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা আজও সমুন্নত রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আজও অঙ্গীকারবদ্ধ। জীবন দিয়ে হলেও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে ছবি : সংগৃহীত

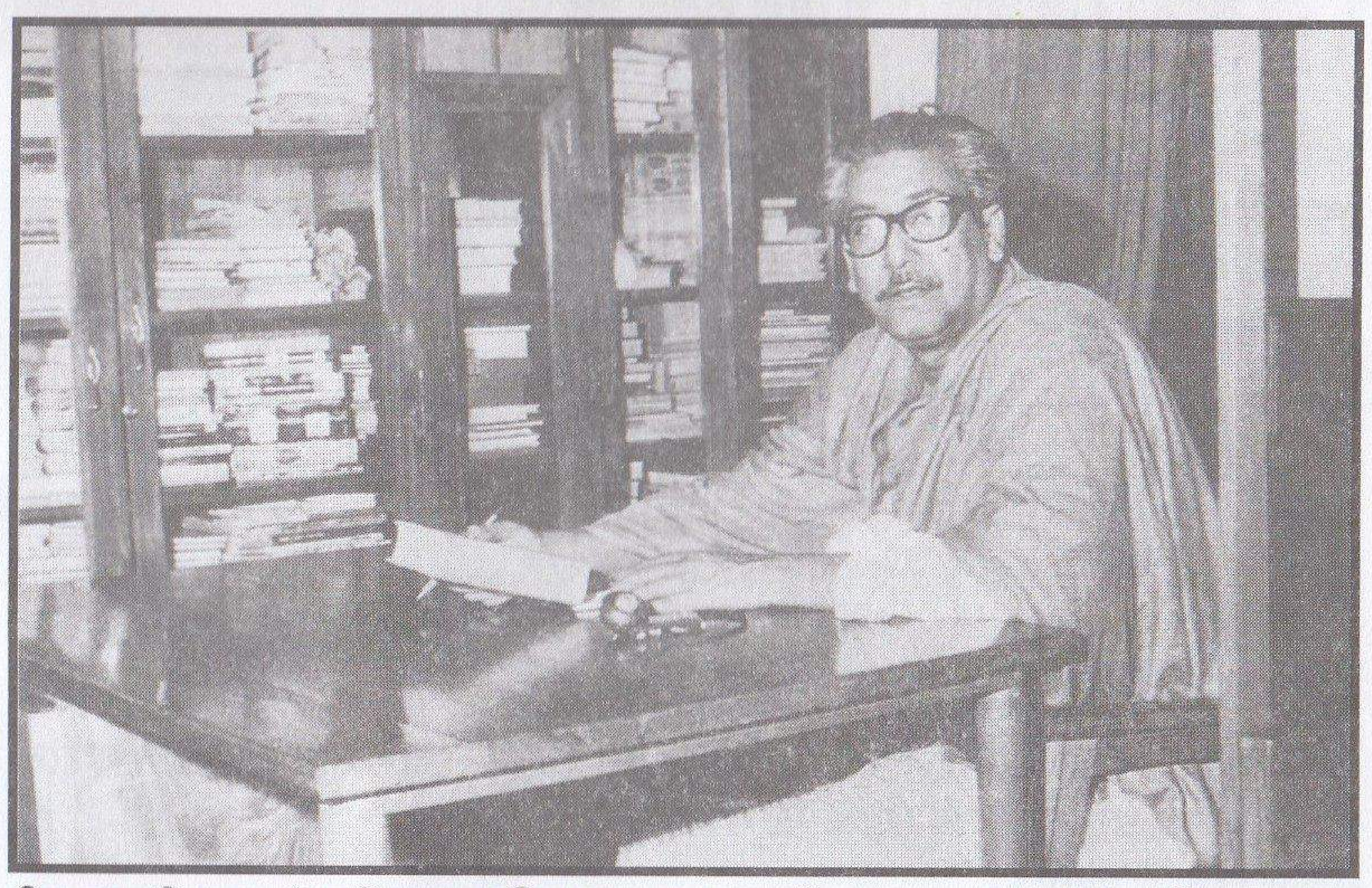

নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে একাকী একান্ত মগ্নে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠলেও খোকার প্রিয় ছিল বই পড়া। বই পড়েই তো সে বড় হতে পেরেছে ছবি : সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ জেলার ছাত্রদের নিয়ে খোকা মুসলিম ছাত্রলীগের শাখা গঠন করে। শহরে কংগ্রেস দলের বেশ দাপট। তাদের জনসভা হলে, আন্দোলন হলে খোকাও যায়। তাদের বক্তৃতাও শোনে। ফরিদপুর থেকে মুসলিম লীগ নেতারাও এসে এখানে সভা করে। তাদের বক্তৃতাও খোকা শোনে। তবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা পত্রিকায় পড়ে পড়ে তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। তিনি বাঙালিদের নেতা হিসেবে খুব জনপ্রিয়। তিনি ইংরেজদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কত সুন্দর করে কথা বলেন। পড়তে পড়তে খোকার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

এরমধ্যে একদিন শহরের নেতাদের কাছে খবর শোনা গেল কলকাতা থেকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে আসবেন। শহরের সব দলের নেতারাও এক হয়ে সংবর্ধনা কমিটি তৈরি করলো। খোকা স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী হিসেবে কাজ করলো। তারা এলেন এবং বেশ বড় সভায় বক্তৃতা করলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিশন স্কুল দেখতে এলেন। স্কুল দেখা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ খোকা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিনয়ের সঙ্গে বলে ওঠে, 'স্যার আমাদের একটা আবেদন আছে।' সোহরাওয়ার্দী হেসে বলেন, 'বলো বলো। শুনি তোমাদের আবেদন।'

খোকা বলে, 'স্যার আমাদের স্কুলের কয়েকটা ক্লাশের ছাদ ফুটো। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। ক্লাশ করা যায় না। আপনি মেরামতের ব্যবস্থা করতে বলে দেন।' খোকার কথা বলার ভঙ্গি দেখে সোহরাওয়ার্দী মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'এতো আবেদন নয়, ন্যায্য দাবি করেছ। অবশ্যই মেরামত করা হবে। আমি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি তাকে কাছে ডেকে আদর করলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন। ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখতে বললেন। কলকাতা গেলে দেখা করতে বললেন।

পরদিন স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে খোকা বন্ধুদের নিয়ে মাঠে ভলিবল খেলছিলো। খেলা শেষ হতেই স্কুলের কয়েকটি ছেলে এসে খোকা ও তার বন্ধুদের ঘিরে দাঁড়ায়। ওরা বলাবলি করে,

ঃ এই ছেলেটা? আচ্ছা আচ্ছা।

ঃ হ্যাঁ খুব সাহস। মিটিং শুনতে গেছিল সেদিন, নারে?

ঃ ক্লাশের ছেলেদের ও নাকি আবার নেতা।

ঃ কোথায় বাড়ী তোদের? একজন প্রশ্ন করে।

খোকা কোন জবাব দেয় না। ওর বন্ধুরা একসঙ্গে বলে ওঠে,

ঃ টুঙ্গিপাড়ার ছেলে।

ঃ কি নাম তোমার?

খোকা এবার স্মিত হেসে লাজুক চোখে তাকায় শুধু। পেছন থেকে দুজনকে ঠেলে সামনে এসে তাঁরা দাঁড়ায়। তারপর জোরালো কণ্ঠে জবাব দেয়,

ঃ শেখ মুজিবুর রহমান।

---

* Northern University * Bangladesh
NUB Library